চন্দ্রচকোর

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীমান রাজা—

কল্যাণীয়েষু

ঃ রচনাকাল ঃ

ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল ১৯৫৯
এবং মে জুন ১৯৬১

ঃ এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কর্ণফুলি	রাজা ও মালিনী
রঙের বিবি	মিতালীমধুর
অনুরঞ্জিতা	নিশীথনিঝুম
বেগমবাহার লেন	অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা
পূর্বরাগের ইতিহাস	দুলারীবাঈ
অন্তরতমা	ইমন বেহাগ বাহার
বিশাখার জন্মদিন	বাহাদুর শার সমাধি
চায়না টাউন	অতনু ও জীবনদেবতা

ঃ অনুবাদ ঃ

THE FOREST GODDESS
(শ্রীমনোজ বসুর জলজঙ্গলের ইংরেজী অনুবাদ)

এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র, চরিত্রের নাম, ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

॥ এক

শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে এক আধো-অভিজাত পাড়ায় কাঠা চারেক জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট নীহার চাটুজ্যে।

নিরিবিল পাড়া। ট্রাম-লাইন থেকে হেঁটে যেতে মিনিট দশ লাগে। এককালে এ-পাড়ায় জমির দর ছিলো পাঁচশো থেকে সাতশো। তখন অনেকেই দশ কাঠা, পনেরো কাঠা, কুড়ি কাঠা জমি নিয়ে বাগানবাড়ি করেছিলো। তারপর জমির দর যতো বাড়তে লাগলো, ততোই কমতে লাগলো জমির আয়তন। নীহার বাবু জমি কিনেছিলেন সাড়ে তিন হাজারে। ইদানিং দর হয়েছে ছ-হাজার। তবে পাড়া ভরে গেছে। জমি আর পাওয়া যায় না। কিনতে হলে বাড়ি শুদ্ধ কিনতে হয়। পাঁচশো সাতশো হাজারে যারা কিনেছিলো তারাই শুধু বেচতে চায়। যারা তিন-চার-পাঁচ হাজারে কিনেছে তারা বেচতে চায় না, বেচতে চাইলেও পারে না,—কারণ অনেকের বাড়িই ব্যাঙ্ক বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কাছে বাঁধা। বাইরে থেকে দেখতে মনে হয় সবারই মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। কারণ, বেশির ভাগ বাড়ির স্থাপত্যই হালফ্যাশানের, ঝকঝকে ড্রয়িং-রুম সবারই আছে, সবারই বাড়িতে রেডিও বাজে, প্রায় সবারই বাড়ির সামনে গাড়িও দেখা যায়,—সে নিজেরই হোক বা গ্যারাজের ভাড়াটেরই হোক। সব বাড়িতেই ফ্যান ঘোরে, দু'চারটি বাড়ির জানলার নিচে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্রও দেখা যায়। এ-পাড়ায় ভাড়াটে হয়ে আসতে হলেও ভালো রোজগার থাকতে হয়। কারণ, তিনখানা ঘরের একটি ফ্ল্যাটের ভাড়াই দুশো। ভাড়ার খোঁজ করতে এলেই বাড়ির মালিক জিজ্ঞেস করে,—আপনি কি করেন? উত্তর শুনে যদি মনে হয় ফ্ল্যাট-প্রত্যাশীর মাসিক আয় হাজারের কম, বলে দেয় বাড়ি আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।

তাই শুধু উপর উপর দেখতেই ঝলমলো। কারো সঙ্গে কারো মেলামেশা নেই, বেশী যাওয়া আসা নেই। কেউ কারো ব্যাপারে মাথা না ঘামানোরই ভান করে। কি জানি, যদি ঘরের কথা বাইরে জানাজানি হয়ে যায়! যদি লোকে জেনে যায় এর মাসিক রোজগারের প্রায় অর্ধেক বাড়ি-ভাড়াতেই চলে যায়, ওর আয়ের তিন ভাগের দু-ভাগ চলে যায় মরগেজের সুদ ও কিস্তি দিতে, তাহলে তো মুখ থাকে না।

কিন্তু যা জানবার সবাই ঠিক জেনে যায়। তবে প্রত্যেকেরই অবস্থা প্রায় একই রকম বলে কেউ এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না।

আর দশজনের মতোই নীহার চাটুজ্যে। হাইকোর্টে পশার জমানোর জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেই তরুণ বয়েস থেকে। ইদানিং পয়সার মুখ দেখতে সুরু করেছেন। কিছু পৈত্রিক, কিছু নিজের সঞ্চয় থেকে বছর কয়েক আগে বাড়িটি তৈরি করেছেন। তবে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু দেনাও করতে হয়েছে। সে-দেনা যে শোধ হয়নি, একথা প্রতিবেশীদের দু'চারজন যে জানে না তাও নয়। তবে তাঁর দুর্ভাবনাও তেমন কিছু নেই। সংসারটি ছোটো,— শুধু তাঁর স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে পাপিয়া। মেয়ে বড়ো হয়েছে, বি-এ পড়ে, বছরখানেকের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর তো আর কোনো ভাবনাই নেই। সুতরাং নীহারবাবু আশা করেন যে জীবনের শেষ কয়েকটা বছর মোটামুটি ভালো-ভাবেই কেটে যাবে।

নীহারবাবুর পাশের যে বাড়ি, সেটি পনেরো কাঠা জমির উপর। বাড়ি বেশী বড়ো নয়, কিন্তু চারদিকে সুন্দর বাগান। বাড়ির মালিক ত্রিদিবেশ সেন। এককালে ছিলেন এক বিলিতী মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু। এ-পাড়ায় যখন জমির দর ছিলো তিনশো, তখন জমি কিনে রেখেছিলেন, পরে বাড়ি করেছিলেন

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায়। কিন্তু বাড়িতে বসবাস করবার সুযোগ হয়নি। ছেলেরা চাকরি করে বাংলার বাইরে। তিনিও থাকেন তাদের সঙ্গে। বাড়িতে থাকে ভাড়াটে। বাঙালীকে তিনি ভাড়া দিতে চান না, কারণ মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে বেশী ভাড়া পাওয়া যায়, এবং ওরা দেড়-বছর দু-বছরের বেশী থাকেও না। সুতরাং প্রত্যেক নতুন ভাড়াটে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভাড়া বাড়িয়ে দিতে অসুবিধে হয় না।

তাইতে সতেরো নম্বর বাড়ির মন্মথ মুখুজ্যের খুব রাগ। একি অন্যায়,—তিনি বলতেন,—অন্য প্রদেশের লোকের কাছ থেকে বেশী ভাড়া পাওয়া যাবে বলে বাঙালী বাড়িওয়ালা বাঙালী ভাড়াটে রাখবে না? তাহলে বাঙালী ভাড়াটে কোথায় যাবে? বাঙালীকে কলকাতায় বসবাস করতে হলে নিজে বাড়ি বানিয়ে থাকতে হবে নাকি? এভাবে চললে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা শহরে আর বাঙালী বেশী দেখা যাবে না।

তাঁর কি-রকম স্বজাতি প্রীতি, কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল। সে-বছর মন্মথ মুখুজ্যের বড়ো ভাই পূব-বাংলার গাঁয়ের সাত-পুরুষের ভিটের মায়া কাটিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আশ্রয় নিলেন মন্মথবাবুর বাড়িতে। গ্যারাজের উপরে একটি ছোটো ঘরে থাকতো চাকর-বাকরেরা। তাদের সরিয়ে বড়ো ভায়ের পরিবারের জায়গা করে দিলেন মন্মথবাবু। আর কোথায় জায়গা দেবেন! বাড়িতে বেড-রুম মোটে তিনটে। একটিতে নিজে সস্ত্রীক থাকেন, আরেকটিতে বড়ো ছেলে আর তার বৌ, অন্যটিতে নিজের অবিবাহিতা কন্যা। জায়গা কোথায়? ছোটো ছেলে জার্মানীতে আছে। সে ফিরে এলে তো ঘরের রীতিমত অভাবই হবে। হ্যাঁ, ড্রয়িং-রুম আছে, ডাইনিং-রুম আছে,—কিন্তু সেগুলো তো খালি করে দেওয়া যায় না।

বাড়ির তেতলা না তুললে আর চলছে না, মন্মথবাবু বলতে লাগলেন সবাইকে। মনে মনে খুশী হলেন মন্মথবাবুর বড় ভাই,

কুণ্ঠিতও হলেন। তিনি দুঃস্থ, ছোটো ভায়ের আশ্রিত, তাঁর জন্যে আবার এতগুলো টাকা খরচ করবে সে ?

আমি বরং কোথাও অল্পভাড়ার একটি ঘর দেখে উঠে যাই,—বললেন ছোটো ভাই মন্মথকে।

সেকথা প্রতিবেশীদের শুনিয়ে মন্মথবাবু বলতেন, সে কি হয় ? আমি থাকতে দাদা গিয়ে থাকবে ভাড়াটে বাড়িতে!

কিছুদিন পর দেখা গেল মন্মথবাবুর বাড়ির তেতলা উঠছে। পাড়ার লোক প্রশংসা করলো মন্মথবাবুর। দু-চারজন চুপি চুপি জানবার চেষ্টাও করলো নিচের ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে কি না। জানতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলো।

মন্মথবাবুর বড়ো ভাই, ভায়ের বৌ আর ছেলেমেয়েদের খুব খুশী-খুশী মুখ। দেড়তলার ছোটো একখানা ঘরে ওদের কষ্ট হচ্ছিলো খুব। বড় ভাই খুব উৎসাহ নিয়ে মিস্ত্রি মজুরদের কাজকর্মের তদারক করতে লাগলেন।

তেতলা উঠে গেল। একতলা দোতলা খালি করে দিয়ে মন্মথ মুখুজ্যে মালপত্তর নিয়ে উঠে এলেন তেতলায়। একতলা দোতলায় এলো দু'ঘর ফ্যাশানদুরস্ত সিন্ধী আর মাদ্রাজী ভাড়াটে। মন্মথবাবুর বড়ো ভাই সপরিবারে উঠে গেলেন কসবা অঞ্চলের এক বস্তীতে।

অবাক হোলো প্রতিবেশীরা।

ব্যাপারটা কি ?

জানা গেল দু'দিনেই। কোম্পানি-লীজের বন্দোবস্তিতে বাড়ির একতলা দিয়ে দিয়েছেন এক বিলিতী ফার্মকে। ওদের দুজন অফিসারের কোয়ার্টার্স নির্দিষ্ট হয়েছে এই দুটো ফ্ল্যাটে।

আর সেই বিলিতী ফার্মের কাছ থেকে পাওয়া অগ্রিম টাকায় বাড়ির তেতলা করিয়ে নিয়েছেন হিসেবী সংসারী মানুষ মন্মথ মুখুজ্যে।

তবে হ্যাঁ, একেবারে অবিবেচক লোক মন্মথবাবু নন। বড়ো ভাই কসবার যে বস্তীতে থাকেন, তার ভাড়ার তিরিশটা টাকা মন্মথবাবুই দিয়ে দেন। সবাইকে সে কথা জানাতেও ভোলেন

না, আর বলেন,—নিচের ফ্ল্যাটে বাঙালী এলেই খুশী হতেন, কিন্তু উপায় কি, কোম্পানি এখন ফ্ল্যাটের মালিক, ওরা যাকে খুশী ফ্ল্যাট দেবে, তাঁর তো এ ব্যাপারে হাত নেই। গালাগাল দেন বিদেশী পুঁজিপতিদের, ওরা বাঙালীকে চাকরি না দিয়ে পাঞ্জাবী সিন্ধীকে দেয় বলে।

প্রতিবেশীরা যে যার নিজের বাড়ি বসে মন্মথবাবুকে গালাগাল ঠিকই দেয়। বলে, লোকটা কী হিপক্রিট, একেবারে চাষা, জানোয়ার। কিন্তু পথে দেখা হলে অমায়িক হেসে কুশল প্রশ্ন করে। তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে ভালো ভালো উপহারও দিয়েছে। তাঁর ছেলে জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তার উপর কন্যাদায়গ্রস্ত অনেকের লোলুপ দৃষ্টিও আছে।

দখিণ.পাড়ার এই সাম্প্রতিক আভিজাতিক কৌলিন্যে রূপায়িত পাড়ায় কাঠা চারেক জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট নীহার চাটুজ্যে। তিনি যখন জমি কিনেছিলেন, তখনো এ-পাড়া পুরো অভিজাত হয়ে উঠেনি, যদিও জমির দাম উঠে গিয়েছিলো সাড়ে তিন হাজারে। সুতরাং তাঁর বাড়ির স্থাপত্য এবং জীবন-যাত্রার ধরণও ছিলো মধ্যবিত্ত মানের।

বেশ সোজাসুজি জীবন। সকালবেলা মক্কেল আসে, তাদের সঙ্গে বসে মামলার নথিপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করেন। দুপুরবেলা কাটে কোর্টে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে অফিসঘরে বসে আবার কাজকর্ম করেন। তিনমাস অন্তর ব্যাঙ্কে মরগেজের সুদ আর কিস্তি জমা দেন। মাসের প্রথম দিকে পাওনাদার বিদেয় করেন, রোববার সন্ধ্যায় সিনেমায় যান স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে। সস্তায় একটি ছোটো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কেনবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু যতদিন বাড়ির দেনা মিটে না যায় বা মেয়ের বিয়ে না হয়ে যায়, ততদিন আর খরচা বাড়ানো সম্ভব নয়। রোজগার স্বচ্ছল হলেও সীমাবদ্ধ, অনেক হিসেব করে চলতে হয়।

পাপিয়া মেয়েটি শ্যামলা, মিষ্টি দেখতে, কিন্তু সুন্দরী নয়। ওস্তাদের কাছে গান শেখে, রেওয়াজ করে সকাল-সন্ধ্যায়। খাতা বই নিয়ে তাঁতের শাড়ি পরে কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে। পরীক্ষার আগে কান্নাকাটি করে। বিকেলবেলা পাড়ার চেনা মেয়েদের সঙ্গে একটু রাস্তায় বেড়ায়। পাড়ার বা বেপাড়ার কোনো ছেলে তার দিকে তাকালে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আর মাঝে মাঝে মা-বাবার কথাবার্তা শোনে ঘরের দরজায় আড়ি পেতে।—তার জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় থেকেই। এখনো সুবিধে হয়ে ওঠেনি।

মাঝে মাঝে :পাপিয়ার মন খারাপ হয়ে যায় মা-বাবার দুর্ভাবনা দেখে। তারপর আবার সিনেমা-ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে সেই বিষণ্নতা কাটিয়ে ওঠে।

॥ দুই ॥

সেদিন সকালবেলা একতলার অফিসঘরে আইনের বই আর নথিপত্র নিয়ে বসেছিলেন নীহার চাটুজ্যে।

কিন্তু কাজে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না একটুও, কারণ দোতলায় বসে রেওয়াজ করছিলো তাঁর মেয়ে পাপিয়া। নীহার বাবু রীতিমত বিরক্তি বোধ করছিলেন, তবে যতক্ষণ একলা বসে কাজ করছিলেন ততক্ষণ মেয়েকে মানা করে আসা প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু একজন প্রতিবেশী যখন একটা মামলার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন তাঁকে বসিয়ে নীহারবাবু একবার উপরে উঠে এলেন এবং কন্যাকে জানালেন যে পূর্বাহ্নকাল বেহাগ রাগিণীর রেওয়াজ করবার শাস্ত্রসম্মত সময় নয়। তা-ছাড়া, তাঁর মক্কেলরা যখন সবাই রাগসংগীতের সমঝদার নয়, তখন এ-সময়টা রেওয়াজ না করাই বাঞ্ছনীয়।

পাপিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করে জানালো যে আর দশদিন পরে তাদের কলেজের ছাত্রীসংঘের বাৎসরিক প্রীতিসম্মেলন এবং সেখানে তাকে খেয়াল আর ঠুংরি গাইতে হবে।

আদুরে কন্যার নিরুপায় পিতা অতঃপর তাঁর আইনের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

পাপিয়া একটু হেসে তানপুরা নামিয়ে রাখলো।

নীহারবাবু চলে যাচ্ছিলেন, দরজার কাছে গিয়ে থামলেন।

বললেন,—হ্যাঁ, নিচে চা আর মিষ্টি পাঠিয়ে দেতো। বরং তুই নিজেই নিয়ে আয়।

সব মক্কেলকে চা আর মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করা হয় না। যাদের করা হয়, তাদেরও পরিবেশন করা হয় চাকরের হাতে।

তাই পাপিয়া কৌতূহল প্রকাশ না করে পারলো না।

ও বাড়ির মন্মথ মুখুজ্যে,—উত্তর দিলেন নীহারবাবু,—যে সে এলে কি আর তোকে বলতাম রে ?

পাপিয়ার কর্ণমূল আরক্ত হোলো।

মন্মথ মুখুজ্যের কনিষ্ঠ পুত্ররত্ন যে জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছে, এবং তার উপর যে নীহার চাটুজ্যের লুব্ধ আগ্রহ আছে, এ-কথা পাপিয়ার অজানা ছিলো না।

পাপিয়া যখন চা তৈরী করে নিচে নিয়ে গেল, কাজের কথা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। তখন তাঁরা আর দশজন প্রৌঢ়ের মতো এ-বাড়ি ও-বাড়ির বিভিন্ন সরস ব্যাপার আলোচনা করছিলেন।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে পাপিয়া শুনলো মন্মথবাবু বলছেন, ত্রিদিবেশকে তখন বললাম,—তুমি ভায়া বিদেশে পড়ে থাকো, বাড়ি যদি ভাড়া দেবেই, আমার ভায়রাভাইকে দাও। সে বড়ো অফিসার, ভাড়াটা ঠিকমতো দেবে, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। ওরকম বাড়ি অতো টাকা ভাড়ায় কজন আর নিতে পারবে ?—কিন্তু সে তো শুনলো না আমার কথা। আগের বার এক পাঞ্জাবীকে ভাড়া দিলো। সে তো ছ-মাস পরে চলে গেল দু-মাসের ভাড়া বাকী ফেলে। এতদিন খালি পড়ে থাকবার পর শুনছি নাকি বাড়িটা আবার ভাড়া হয়েছে। ভাড়া নাকি সাড়ে সাতশো, এক বছরের ভাড়া আগাম নিয়েছে।

সাড়ে সাত শো! চোখ কপালে তুললেন নীহারবাবু।

দরজার বাইরে পাপিয়া একটু দাঁড়ালো।

দেখ তো!—মন্মথ মুখুজ্যে বলে গেলেন,—টাকাটাই বড় হোলো ত্রিদিবেশের কাছে ? এত বছর ধরে এ-পাড়ায় আমরা আছি, যখন এধারে ওধারে সব জলা মাঠ ছিলো, সেই তখন থেকে। আমরা সবাই এত চেনা-জানা, এত আপনার জন মনে করি সবাইকে। আর এখন দেখ, আস্তে আস্তে একঘর দু'ঘর করে আজে বাজে ফালতু লোক পাড়ায় ঢুকতে আরম্ভ করেছে। কেন ?

না, আমাদের বাড়িওয়ালাদের বেশী টাকা চাই। বারোর একের দোতলার ফ্ল্যাট কি ওই মিসেস দত্তকে ভাড়া না দিলে চলতো না?

মিসেস দত্তর নাম শুনে নীহারবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন,—এই সকাল বেলা কেন আর ওর নাম করছো? ভদ্রমহিলা পোশাকে পরিচ্ছদে আচারে ব্যবহারে অত্যন্ত অশালীন।

—যা বলেছো। ওঁকে দেখলে লজ্জায় চোখ নিচু করে চলতে হয়।

—ওঁকে এ-পাড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

—কে আর তাড়াবে? পাড়ার ছেলেদের ক্লাবে মোটা চাঁদা দিয়ে ওদের বশ করে রেখেছে।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দুই প্রৌঢ় আধুনিক কালের আদর্শবিহীন তরুণদের নীতিবোধের অভাব আলোচনা করে একমত হলেন।

চার নম্বরের তেতলায় যারা থাকে,—একটু চাপা গলায় বললেন মন্মথবাবু, ওদের কথা তো সবই জানো।

—ওসব কথা কি চাপা থাকে? নেহাত ভদ্রলোকের পাড়া, তাই এসব নিয়ে কেউ আলোচনা করতে চায় না। নিজের বাড়ি, তাই। নইলে হয়তো এ-পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হতো। দিনের পর দিন যা দেখছি, স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এ পাড়ায় কি করে থাকা যাবে তাই ভাবছি।

মজুমদারদের বাড়িতে আজকাল প্রায়ই ককটেল পার্টি হচ্ছে। রাস্তা থেকে দেখা যায়!—চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন মন্মথবাবু।

—ওই সিঙ্ঘিদের বাড়িতে সেদিন দেখলাম রক্-এন্-রোল্ হচ্ছে।

দত্ত চৌধুরীদের মেয়েটা ঠোঁটে রং মাখে আজকাল। সেদিন দেখলাম গাড়ি হাঁকিয়ে ওর বয়-ফ্রেণ্ড এসে ওকে তুলে নিয়ে গেল। যে ভাবে বসেছিলো খোলা গাড়িতে, ইস্, কি নির্লজ্জ!

ছিঃ ছি ছি—!

ছ্যাঃ!

আমাদের কালে কি কোনোদিন—

কক্ষনো না।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মন্মথবাবু বললেন, এসব আর কি দেখছো? শিগগিরই যা দেখতে পাবে, তার তুলনায় এসব কিছুই নয়।

কি দেখবো?

ফিল্মস্টার।

ফিল্মস্টার?

হ্যাঁ, ফিল্মস্টার, কলকাতার নয়, একেবারে খাস বম্বের। সে কথাই তো বলছিলাম। এ কি করলো ত্রিদিবেশ?

ত্রিদিবেশের সঙ্গে চিত্রতারকার কী সম্পর্ক নীহারবাবু অনুধাবন করতে পারলেন না।

আরে, ত্রিদিবেশের বাড়িটাই তো সে ভাড়া নিয়েছে।

ত্রিদিবেশের বাড়ি?—নীহারবাবু বিচলিত হলেন। বোম্বের ফিল্মস্টার?—তীব্রতর উৎকণ্ঠা অনুভূত হোলো নীহারবাবুর কণ্ঠে। ত্রিদিবেশের বাড়ি ঠিক তাঁর বাড়ির পাশেই।

কোন ফিল্মস্টার? নাম কি?—জিজ্ঞেস করলেন নীহারবাবু।

মন্মথবাবু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দরজার ওদিকে চোখ পড়লো। পর্দার আড়ালে একপাশে দাঁড়িয়েছিলো পাপিয়া।

ওখানে কে?

চা আর মিষ্টির ডিশ নিয়ে পাপিয়া ঘরে ঢুকলো। চুপ করে রইলো দুই পর-চর্চারত প্রৌঢ়। পাপিয়া হাসি চেপে চায়ের কাপ আর খাবার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তবে একেবারে চলে গেল না। দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতলো।

অল্পবয়েসী মেয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে প্রৌঢ় দু'জন আবার সহজ হলেন।

কোন ফিল্মস্টার? নাম কি? প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন নীহার চাটুজ্যে।

মন্মথ মুখুজ্যে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, শুনতে চাও?

আহা, বলোই না।

তোমাদের সেই কাজলকুমার।

কাজলকুমার !!! নীহারবাবুর মুখ হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো। এই তো সেদিনও ওর একটি ছবি দেখে এসেছেন। কী সুন্দর চেহারা, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু তারপরই ফাঁপা শোনালো নীহারবাবুর কণ্ঠস্বর,—কাজল-কুমার ?—আস্তে আস্তে বললেন,—ওর সম্বন্ধে তো নানারকম কথা শোনা যায়।

সিনেমা-ম্যাগাজিন তুমিও পড়ো তা হলে ?—তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন মন্মথবাবু।

—না ভাই, সিনেমা-ম্যাগাজিন নয়, নানা রকম কেচ্ছাদার মামলায় তো ওর নাম শোনা গেছে। বার এসোসিয়েশানের ছোকরা এ্যাডভোকেটরা আলোচনা করে সে·সব, তাইতে ছু-চার কথা কানে আসে। তার মতো লোক পাশের বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে, এ তো ভালো কথা নয়, মন্মথ।

মন্মথ মুখুজ্যে নীহার চাটুজ্যের সঙ্গে একমত হলেন। কাজলকুমারের নাম শুনলে সিনেমার টিকিট সাত দিন আগে থেকে কিনে রাখা যায় কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে সে মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

ত্রিদিবেশ সেনের বাড়ি থেকে নীহারবাবুর বাড়ির দক্ষিণের জানলাগুলো সব দেখা যায়। সে সব যে সব সময় বন্ধ রাখা কর্তব্য হবে এরপর থেকে, নীহারবাবুকে সে সম্বন্ধে অবহিত করে মন্মথবাবু গাত্রোত্থান করলেন।

পাপিয়া তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলো। তারপর এগিয়ে গেল জানলার দিকে। পর্দ্দা সরিয়ে পাশের বাড়ির দিকে তাকালো।

সে বাড়ি খালি পড়ে আছে কিছুদিন থেকে। দরজা জানলা

সব বন্ধ। বাড়ির তদারক করবার জন্যে শুধু একজন মালী আছে। সে তখন বাগানে নিজের মনে কাজে করছিলো।

পাপিয়া ফিরে এলো নিজের পড়ার টেবিলে। বই খুলে বসলো, কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করে দেখলো কিছুতেই পড়ায় মন বসছে না। সামনের জানলার ওপারে খোলা আকাশ। চোখ দুটি মেলে দিলো সেদিকে। তারপর গুনগুন করে গাইলো একটি গানের কলি,—একটি বিখ্যাত ছায়াচিত্রের জনপ্রিয় গান।

একপাশে পড়েছিলো একটি সিনেমা-পত্রিকা। সেটি টেনে নিয়ে একটি পাতা উল্টে দেখলো পাপিয়া।

সে-পাতায় আর্ট পেপারে ছাপা একটি ছবি। খুব সুন্দর সেই মুখখানি!

পাপিয়া সেদিনই কলেজে গিয়ে সহপাঠিনীদের জানালো,—জানিস্, আমাদের পাশের বাড়ি কে ভাড়া নিয়েছে?

কে রে?

কাজলকুমার।

কা জ-ল-কু-মা-র !!!!

যে শুনলো সে-ই চোখ বড়ো বড়ো করে বললো,—ও মা! তাই নাকি? কবে থেকে?

॥ তিন ॥

দিন তুই পর একদিন বিকেল বেলা কোর্ট থেকে ফিরে নীহার-বাবু দেখলেন আশেপাশের প্রত্যেক জানলায় দরজায় নানাবয়েসী ছেলেদের ভিড়, মেয়েদের ভিড়। রাস্তায়ও এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। সবারই চোখ ত্রিদিবেশ সেনের বাড়ির দিকে।

এরকম সময় নীহারবাবুর স্ত্রী মনোরমা প্রায় নিচেই থাকেন, কিন্তু আজ দেখা গেল না তাঁকে। চাকরের কাছে শুনলেন উনি উপরে নিজের ঘরেই আছেন। সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে এলেন নীহারবাবু। নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন জানলার পর্দা একটুখানি ফাঁক করে মনোরমা তাকিয়ে আছেন পাশের বাড়ির জানলার দিকে। সে জানলায় কেউ নেই।

নীহারবাবুর সাড়া পেয়ে মনোরমা তাড়াতাড়ি সরে এলেন ঘরের ভিতর, বললেন, এরই মধ্যে এসে গেলে? জানো, ও-বাড়ি কে ভাড়া নিয়েছে?

চায়ের কতো দেরী? গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন নীহারবাবু।

মনোরমা নিচে চলে গেলেন। নীহারবাবু বন্ধ করে দিলেন জানালাটা। তারপর ঘরের বাইরে এসে ডাকলেন, পাপিয়া!

পাপিয়ার ঘরটা ঠিক পাশেই। দরজা ভেজানো। পাপিয়ার কোনো সাড়া এলো না।

নীহারবাবু আবার ডাকলেন, পাপিয়া!

এবারও কোনো উত্তর পেলন না।

নীহারবাবু পর্দা সরিয়ে দরজা ঠেলে মেয়ের ঘরে ঢুকলেন। ঢুকতেই দেখতে পেলেন পাপিয়া দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে। একলা নয়। জানলার কাছে ভিড় করেছে পাপিয়াদের কলেজের আরো চার-পাঁচজন তন্ময় মেয়ে।

ভাবলেন, বেশ কড়া গলায় ধমক দিয়ে জানলা বন্ধ করে দিতে বলবেন।

কিন্তু বলা হোলো না। একটি সুন্দর মুখের আবির্ভাব হোলো পাশের বাড়ির জানলায়।

নীহার চাটুজ্যের মনে হোলো এ-মুখ যেন খুবই চেনা। তাকিয়ে দেখলেন ভালো করে।—হ্যাঁ, চেনা তো বটেই। পথে ঘাটে সিনেমার হোর্ডিংএ পোস্টারে সিনেমা-ম্যাগাজিনে এ-মুখ যে চোখে পড়ে সব সময়ই।

তিনি নিজেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যভরে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

এদের দেখে কাজলকুমার নামে সেই সুপুরুষ নিজের জানলাই জোরে বন্ধ করে দিলো।

কেটে গেল বেশ কিছুদিন। কাজলকুমারের সেই জানলা সেদিন থেকে আর খুলতে দেখা গেল না। সামনের দিকের জানলাগুলিই বন্ধ থাকতো প্রায় সব সময়ই। বেশ চুপচাপ নিরিবিলি নিস্তব্ধ বাড়ি, কোনো সাড়াশব্দ নেই।

অথচ পাড়ায় সবাই জেনে গেল যে ঐ বাড়িতে একজন বাবুর্চি আছে, একজন বেয়ারা আছে, একজন মোটা মাইনের সেক্রেটারি. দারোয়ান, ড্রাইভার আর সম্পর্কের এক ভাই আছে, লোকজনের অভাব নেই তেমন কিছু। অতিথি অভ্যাগতও প্রায়ই আসে। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে ভেতরে গাড়িবারান্দার আশে পাশে। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই, কোনো হৈ-হুল্লোড় হট্টগোল নেই, শুধু মাঝে মাঝে টেলিফোনের ঘন্টি।

কাজলকুমারকে সারাদিনে দেখা যেতো দুবার কি তিনবার। ড্রাইভার থাকলেও প্রায়ই নিজে গাড়ি চালাতো সে। হুশ করে বেরিয়ে যেতো তার মস্তো বড়ো ঝকঝকে গাড়ি, হুশ করে ফিরে আসতো। এক পলকের বেশী দেখা যেতো না তাকে।

তার সম্বন্ধে সবার অদম্য কৌতূহল। সে যে কলকাতায়

এসেছে নিজের একটি ছবির প্রয়োজনা করবে বলে, খবরের কাগজের সিনেমার পাতার মারফত সে খবর সবাই জেনেছে, সে এ-পাড়ায় আসবার আগেই। এখন পাড়ায় সবার জানবার ইচ্ছে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে, যাচাই করে দেখবার ইচ্ছে তার সম্বন্ধে যা কিছু সব শোনা যায়, তার কতখানি সত্যি। সে কতক্ষণ বাড়ি থাকে, কখন বাইরে যায়, বাড়িতে যতক্ষণ থাকে তখন কি করে, বাড়িতে কারা আসে, কখন আসে,—নানারকম প্রশ্ন সবার মনে।

কিন্তু শুধু তার বাড়ির উপর নজর রেখে কিছু জানবার উপায় নেই। জানলায় কাউকে দেখা যায় না, দরজা বন্ধ থাকে সব সময়। বাড়ির চাকর বাবুর্চিরও খুব রাশভারী মেজাজ, তারা পাড়ার ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, সুতরাং ওই সূত্র থেকেও কিছু জানবার উপায় নেই।

কাজলকুমারের সঙ্গে তার যে মাসতুতো ভাইটি থাকতো, সে মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিগারেট কিনতে আসতো মোড়ের পানের দোকানে। তার সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে ভাব জমে গেল পাড়ার ছেলেদের। কাজলকুমারের ভাই, সুতরাং ছেলেদের কাছে তার খুব খাতির। বেশ মিশুক লোক এই সুবিমল বোস, তবে বোলচাল খুব। সেটুকু সহ্য করে ছেলেরা, কারণ সে কাজলকুমারের মাসতুতো ভাই। সে বলে, কাজল প্রডাক্শান্স্-এর প্রথম বই বলে এবার কাজলকুমার নিজেই নামছে নায়কের ভূমিকায় এবং সুবিমল নামছে একটি পার্শ্বচরিত্রে। তবে কাজল প্রডাক্শান্স্-এর পরের বইতে সেই হবে নায়ক, কারণ কাজলকুমার নিজে আর নিজের বইতে নামবে না। এখন থেকেই সুবিমলের কাছে বম্বে আর কলকাতার পরিচালকেরা যাওয়া আসা করছে, ভালো রোল এবং মোটা টাকা দিতে চাইছে তাকে। কিন্তু কাজলকুমার যখন নিজে বই তুলছে তখন সুবিমল আর অন্যের বইতে নামে কি করে?

এরকম সব বড়ো বড়ো কথা।

পাড়ার ছেলেরা কিছু বিশ্বাস করে, কিছু করে না। বিশ্বাস না করলেও চুপচাপ শুনে যায়। ধৈর্য ধরে বসে থাকে কখন সুবিমল নিজের কথা ছেড়ে কাজলকুমারের কথা সুরু করবে।

তাদের হতাশ করে না সুবিমল, তার কাছে সবাই শোনে সৌখীন সমাজের মেয়েরা কী উন্মাদ কাজলকুমারের জন্যে। তার বান্ধবীর সংখ্যা এত যে, এক এক সময় নাকি তার মনেই থাকে না ওদের কারো কারো নাম। সবাই বড়ো বড়ো ঘরের মেয়ে। হ্যাঁ, যার-তার সঙ্গে মেশে না সুবিমলের কাজল-দা এবং কার সঙ্গে মিশবে না-মিশবে তাও অনেক সময় সুবিমলের সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করে।—একথা শুনে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে পাড়ার ছেলেরা।

পাড়ার বাইরে বড়ো রাস্তার উপর একটি মোটামুটি ভদ্র রেস্তরাঁ আছে। সেখানে বসে সুবিমল এক এক সময় আড্ডা দেয় পাড়ার কলেজী ছেলেদের সঙ্গে।

—তোর দিদির অটোগ্রাফ চাই নাকি রে? বেশ তো, আমায় দিস্ অটোগ্রাফের খাতাটা। তার আগে আমায় একদিন ফ্লুরিতে আইসক্রীম খাইয়ে দিতে বল।

—তোর কি চাই? কাজল-দার একটি সই করা ছবি? আচ্ছা, আমায় একটিন গোল্ডফ্লেক কিনে দে দিকি।

কাজলকুমারের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কেউ বেশী কিছু জানতে পারলো না। সবারই মনে মনে হয়তো একটা আশা ছিলো যে, সামাজিক জীবনেও তাকে দেখতে পাবে ঠিক সিনেমার গল্পের নায়কের মতো। কিন্তু তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে সবাই হতাশ হোলো।

পাপিয়াও পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতো। কিন্তু একদিনও দেখতে পায়নি কাজলকুমারকে। সেই যে প্রথমদিন সে জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলো, তারপর আর খোলেনি একদিনও। সকাল-

সন্ধ্যে পাপিয়া রেওয়াজ করতো। গলা তার খুব তৈরী, কে গাইছে সেকথা জানবার জন্যে আগ্রহ বা কৌতূহল সৃষ্টি করবার মতো তার রাগের বিস্তার ও তান, তবু একদিনের জন্যেও ও-বাড়িতে কাউকে জানলায় এসে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।

পোনেরো নম্বর বাড়িতে একটি মেয়ে থাকতো। তার নাম রেবা। পাপিয়ার কাছে আসতো মাঝে মাঝে। একদিন এসে হাসতে হাসতে বললো, ও-ধারের বড়ো রাস্তার রেস্তোরাঁর আড্ডায় সুবিমল নাকি রেবার দাদাকে বলেছে যে, কাজলকুমার ভাবছে এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাবে।

কেন ?

কারণ, প্রত্যেকদিন সকালবেলা নাকি কাজলকুমারের মাথা ধরে। আর ঠিক সে-সময় নাকি এপাশে না ওপাশে কোনো একটা বাড়িতে কোনো একটি বাচ্চা মেয়ে বেসুরো গলায় চিৎকার করে আ-আ-আ-আ করে কালোয়াতি করে।

বাচ্চা মেয়ে ?—শুনে পাপিয়ার রাগ হোলো। বেসুরো গলায় ? —শুনে ক্ষেপে গেল পাপিয়া। সে সেই সাত-আট বছর বয়েস থেকে ওস্তাদ দিলদার খানের কাছে খেয়াল শিখছে।

কলেজের কমনরুমে কাজলকুমার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পাপিয়া এক সহপাঠিনীকে জানালো, প্রত্যেকদিন সকালবেলা নাকি কাজলকুমারের মাথা ধরে।

তাই নাকি ? মাথা ধরে! শুনে যেন খুব খুশী হয়ে উঠলো মেয়েটি।

কিন্তু প্রত্যেকদিন সকালবেলা মাথা ধরবে কেন ?

অনেকের ও-রকম হয়, মেয়েটি বিজ্ঞের মতো উত্তর দিলো।

কিন্তু কেন ?

আগের দিন রাত্তিরে খুব হুইস্কি খেলে পরদিন সকালে বেশ মাথা ধরে। ওকে বলে দিস সকালবেলা একটু জিন্ খেয়ে

নিলে ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের শঙ্করদার কাছে শুনেছি। সত্যি, এই বম্বের লোকেরা এমন! কলকাতায় এলেই সারা বছরের হুইস্কি একসঙ্গে খেয়ে নিতে চায়। —হ্যাঁ রে, কাজলকুমার যখন মাতাল হয়ে যায়, কি বলে রে? শোনা যায় তোর ঘর থেকে?

চিত্রতারকা-অনুরাগিণীর ঔৎসুক্য দেখে পাপিয়া স্তম্ভিত হোলো।

ইদানিং পাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন সময়ের আড্ডায় আলোচনার বিষয়বস্তু বেশির ভাগ সময়ই ছিলো কাজলকুমার। এ-পাড়ার কেউ শহরের অন্য কোনো পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলে তাকে কাজলকুমারের উপর অথরিটি বলে ধরে নেওয়া হোতো। অন্য পাড়া থেকে কেউ এ-পাড়ায় বেড়াতে এলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে নিতো কাজলকুমার কোন বাড়িতে থাকে, তারপর বহুক্ষণ সে-বাড়ির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে চক্ষু সার্থক করতো। মেয়েদের স্কুলের বা কলেজের বাস বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সব ছাত্রীরা একসঙ্গে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো বাড়ির দিকে।

নীহারবাবু উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর কাছে মক্কেলেরা মামলা-মোকর্দমার কাজে এলেও সময় সময় উত্থাপন করতো কাজলকুমারের প্রসঙ্গ।

কাজলকুমার কি আপনাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন? ওকে দেখতে পান?……

ভদ্রলোক কি খুব ড্রিংক্ করেন?……

শুনেছি কাজলকুমারের সঙ্গে অনেক মেয়ের ঘনিষ্ঠতা। ওদের বাড়িতে দেখা যায়?…

অন্য ফিল্মস্টারেরা কাজলকুমারের বাড়ি আসে?… ..

এমন কি মন্মথ মুখুজ্যের মতো রাশভারী লোকও মাঝে মাঝে এসে দু-এক কথা বলতেন।

শুনেছো ভাই নীহার? আমেদাবাদের এক পার্শী ভদ্রলোক নাকি ওর নামে মামলা করবে খুব শিগগিরই। তার স্ত্রীকে নিয়ে ওর নামে নানা কথা শোনা যাচ্ছে।……

মাদ্রাজের ফিল্মস্টার প্রিয়ংবদার সঙ্গে কাজলকুমারের খুব ভাব বলে এক স্টুডিও-মালিকের সঙ্গে নাকি ওর হাতাহাতি হয়ে গেছে।……

বম্বের ফিল্মস্টার দীপাকুমারী নাকি শ্যাম মলহোত্রার বইয়ে লাখ টাকার কাজ তুচ্ছ করে কাজলকুমারের বইতে খুব অল্প টাকা নিয়ে কাজ করছে। কী ব্যাপার বলোতো?……

জানো, ব্যারিস্টার বোসের বৌকে প্রিন্সেস্‌-এ কাজলকুমারের সঙ্গে বসে গল্প করতে দেখা গেছে বলে বার লাইব্রেরিতে সবাই বোসকে জিজ্ঞেস করছিলো, তার বৌ এবার সিনেমায় নামবে কি না। বোস তো শুনে ক্ষেপে লাল। কাজলকুমারকে শুট্‌ করবে বলছে।……

সেদিন ঘোষ সাহেবের গাড়িতে বি-টি রোড দিয়ে আসবার সময় দেখি আমাদের ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বৌকে পাশে বসিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে কাজলকুমার। কে যেন বলছিলো ওর প্রডাকশানে টাকার টান পড়েছিলো। সমস্যাটা সম্প্রতি মিটেছে।……

এই রকম সব নানা ধরণের কথা।

পাপিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে কান পেতে শুনতো প্রায়ই। দু-একদিন ধরা পড়ে বকুনি খেয়েছে।

নীহারবাবু প্রায়ই বলতেন, এ-পাড়ায় আর থাকা যাবে না। কাজলকুমার বেশ ভদ্রলোক, অন্য কাউকে ঘাঁটায় না, নিজের মতো নিজে থাকে, তাকে দেখাও যায় না। কিন্তু পাড়ার অন্যান্য লোকগুলো অসহ্য হয়ে উঠেছে। আগে তো এরকম ছিলো না। এখন দিনরাত ওদের মুখে ওর নাম শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে গেল।

নীহারবাবু মন্মথ মুখুজ্যের কাছে তিনবার তাঁর ছেলের সঙ্গে পাপিয়ার সম্বন্ধের কথা পাড়লেন। তিনবারই মন্মথ মুখুজ্যে কাজলকুমারের গল্প করলো। তিনবারই সব কথার শেষে বললো, আমাদের আজকালকার ছেলেদের নৈতিক অধঃপতন হবে না? এই ফিল্মস্টারেরাই তো ওদের আদর্শ। আমাদের আদর্শ ছিলো রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। আমাদের পড়ার টেবিলের সামনে টাঙানো থাকতো ওদের ছবি। আর এখন?—

চতুর্থবার বিয়ের সম্বন্ধের কথা খানিকটা এগিয়ে গেল।

মন্মথবাবুর ছেলের পড়া শেষ হয়েছে। জার্মানি থেকে ফিরে আসবে মাস দুয়েকের মধ্যে।

॥ চার ॥

খবরটা প্রথমে বেরিয়েছিলো একটি সিনেমা সাপ্তাহিকে। আর দশজনের মতো পাপিয়াও পড়েছিলো। আর দশজনের মতো পাপিয়াও মাথা ঘামায় নি।

তবে যে খবর পড়ে দশজন মাথা ঘামায় না, সে খবর পড়ে যে অন্তত দু-চারজন স্বপ্ন দেখতে পারে, সেকথা পাপিয়া বুঝতে পারলো কলেজে গিয়ে।

ফোর্থ ইয়ারের খুব জনপ্রিয় ছাত্রী দীপ্তি, দেখতেও বেশ ভালো। এবছর কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি হয়েছে।

সে হঠাৎ সেদিন পাপিয়াকে বললো, জানিস? কাজলকুমার নাকি নতুন নায়িকা খুঁজছে?

সে তো সব সময়ই খুঁজছে, পাপিয়া হেসে উত্তর দিলো, অন্তত নিন্দুকেরা তাই বলে।

দীপ্তি হেসে ফেললো,—আমি বলছি ওর ছবির কথা, যে ছবি তুলতে সে কলকাতায় এসেছে।

পাপিয়া হাসলো একটুখানি।

দীপ্তি আস্তে আস্তে বললো, ভাবছি সিনেমায় নামলে কি রকম হয়।

পাপিয়া হেসে ফেললো দীপ্তির কথা শুনে।

তুই সিনেমায় নামতে যাবি কোন দুঃখে? তোর মা-বাবা শুনলে রাগ করবেন না? সে জিজ্ঞেস করলো।

রাগ নিশ্চয়ই করবেন,—উত্তর দিলো দীপ্তি,—অন্তত বাইরের লোককে দেখানোর জন্যে হলেও, করবেন।

পাপিয়া একটু অবাক হয়ে তাকালো দীপ্তির দিকে।

দীপ্তি বলে গেল, তারপর যখন বাড়িতে কাঁচা টাকা আসতে সুরু করবে তখন নিশ্চয়ই মনের ভাব এবং মুখের ভাষা খুব উদার হয়ে যাবে।

ওর কথা শুনে পাপিয়া হেসে ফেললো। সে তখনো ততো গম্ভীরতার সঙ্গে নেয়নি দীপ্তির কথা। বললো, সিনেমায় নামলেই বুঝি খুব টাকা হয়?

বম্বের স্টারেরা কতো পায় জানিস?

তুই কি রাতারাতি স্টার হয়ে যাবি নাকি?

ওর বইতে নায়িকার ভূমিকা যদি পাওয়া যায়, তাহলে—, বলতে বলতে দীপ্তির কপালে একটু ঘাম দেখা দিলো।

এবার পাপিয়ার মনে হলো দীপ্তি নেহাত ঠাট্টা করছে না। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে।

দীপ্তি বুঝলো পাপিয়ার মনের ভাব। বললো, আমার সত্যি সত্যি খুব ইচ্ছে সিনেমায় নামবার।

পাপিয়ার মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, তোর বাবা না তোর বিয়ের চেষ্টা করছেন?

সে তো সবার বাবাই করছেন। চেষ্টা করলেই কি হয় নাকি? যারা এখন মোটা দাবি-দাওয়া ছাড়া কথাই বলতে চাইছেন না, আমি সিনেমায় নামলে' আমায় শুধু এক নজর দেখবার জন্যে বাড়ির আশে পাশে তারাই ঘুরঘুর করে বেড়াবে।

কথাটার মধ্যে অনেক ব্যথা ছিলো। সাম্প্রতিক কালের অসংখ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের অসংখ্য মেয়ের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা।

পাপিয়া একটু ভাবলো আনমনে। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, ওসব মতলব ছেড়ে দে দিকি। ভালো করে বি-এ'টা পাস কর। তারপর তুই আর আমি মিলে একটি নার্সারি স্কুল করবো।

তোদের ভাই অবস্থা ভালো, তাই ওসব ভাবতে তোদের ভালো লাগে। স্কুল-মাস্টারি করা যে কি তাতো জানিস না, আমার মঞ্জুদিকে গিয়ে দেখে আয়।

ছাখ, বোঝাবার চেষ্টা করলো পাপিয়া, শুধু পয়সার জন্যে শিল্পী হওয়া যায় না। আর্টকে ভালোবাসলেই আর্টিস্ট হওয়া যায়।

ফুঃ, উত্তর দিলো দীপ্তি, সিনেমায় পয়সা না থাকলে কোনো মেয়ে সিনেমায় নামতো না। একবার নাম করতে পারলে তারপর সিনেমা-ম্যাগাজিনের জীবনকাহিনীতে বলা যায় যে, পয়সার অভাব ছিলো না, অভিজাত পরিবারের সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যই ছিলো, কিন্তু অভিনয়ের এমন নেশা, আর্টের জন্যে এত ভালোবাসা যে, সমস্ত বাধা-অসুবিধে অগ্রাহ্য করে চলে আসা হোলো সিনেমায়। তুই কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করিস, যে-সব মেয়ে সিনেমায় আসে, তারা সবাই শিল্পীর জীবনকে ভালোবেসে ফিল্ম-আর্টিস্ট হয়েছে? বেশির ভাগ মেয়ে আসে অভাবে পড়ে। বাপ বেশী লেখাপড়া শেখাতে পারেনি, ঠিক মতো পাত্র যোগাড় করতে পারেনি কিংবা স্বামীর রোজগারে সংসার ঠিকমতো চলে না, মেয়ের আর কোনো গুণ নেই যে চাকরি-বাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আনবে, দেখলো হয়তো যে ক্যামেরায় চেহারাটা ভালো আসে, মিষ্টি গলা আছে, চেষ্টা-চরিত্র করে হঠাৎ নেমে গেল সিনেমায়। দু-তিনজন বরাতের জোরে হোক. নিষ্ঠা আর প্রতিভার জোরে হোক উতরে গেল, তলিয়ে গেল বাদবাকী সবাই।

বেশীক্ষণ এ আলোচনা করতে ভালো লাগছিলো না পাপিয়ার। বললো, বেশ তো, তুইও নেমে যা সিনেমায়। তারপর একদিন আমার অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে যাবো তোর কাছে।

দীপ্তি চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কাজলকুমার তো তোদের পাশের বাড়িতেই থাকে,—না?

হ্যাঁ।

আলাপ আছে তোর সঙ্গে?

না।

একটুও না?

না।

পাশাপাশি বাড়িতে থাকিস, তবু আলাপ নেই?

না।

কলকাতা শহরটা কি হয়ে গেল ভাই। লোকে পাশাপাশি থাকে, তবু কেউ কাউকে চেনে না।

পাপিয়া হাসলো দীপ্তির কথা শুনে।

দীপ্তি বললো, তবু তোর সঙ্গে মুখ চেনা আছে তো! চল, একদিন ওর বাড়ি যাই।

মুখচেনাও নেই, উত্তর দিলো পাপিয়া, তুই যেতে চাস তো যা, আমি যেতে পারবো না।

না, না, চল। কলেজের তরফ থেকে যাচ্ছি, অন্তত দুজন যাওয়া দরকার।

কলেজের তরফ থেকে?—পাপিয়া অবাক হোলো।

হ্যাঁ। ভাবছি আমাদের সোশিয়্যালে ওকে প্রধান অতিথি করে আনবো।

কাজলকুমারকে?—পাপিয়ার চক্ষু স্থির।

হ্যাঁ। কি রকম ভিড় হবে একবার ভেবে ছ্যাখ!

কিন্তু সেদিন না ঠিক হোলো ডক্টর রাখাল সেনগুপ্তকে আনা হবে?

ওই বুড়োকে এনে কী লাভ? খুব তাচ্ছিল্যের ভংগিতে বললো দীপ্তি।

আমি তো এই তিন-চার বছর ধরে দেখছি ওসব সাহিত্যিক সাহিত্যসমালোচকদের ডাকলে সোশিয়্যালে কেউ থাকতে চায় না। ওই বুড়োরা বাসে চেপে ড্যাং-ড্যাং করে আসে, আর নৈতিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, শ্রোতাদের একঘেয়ে লাগে, আর আমরা গালাগাল খাই। কেউ শুনতে চায় না, উঠে উঠে চলে যায়। তার চাইতে কাজলকুমারকে আনলে, ভেবে ছ্যাখ, কি রকম উত্তেজনা সুরু হবে। প্রফেসারদের সোশিয়্যালে আসবার জন্যে সাধাসাধি করতে হবে না, আমাদের বুড়ি প্রিন্সিপ্যালও গালে এক পোঁচ পাউডার লাগাবে। হলে জায়গা হবে না। রাস্তায় ভিড় হবে, সেই ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিস ডাকতে হবে—।

এলোমেলো অনেক কথা বলে গেল দীপ্তি—কিছু কথা পাপিয়ার কানে ঢুকলো, কিছু ঢুকলো না। সে ভাবছিলো চিত্রতারকাকে নিয়ে একটু উচ্ছ্বাস, একটু কৌতূহল, সে এমন কিছু দোষের নয়, সবারই থাকে। কিন্তু এত বাড়াবাড়ি কেন? এই তো সেদিন ঠিক হোলো প্রধান অতিথি করে আনা হবে ডক্টর রাখাল সেনগুপ্তকে, এখন কাজলকুমারের কথা মাথায় ঢুকতে ডক্টর সেনগুপ্তকে বাতিল করে দেওয়া হবে? অতো বড়ো পণ্ডিত ডক্টর সেনগুপ্ত, ছাত্রীদের সোশিয়্যালে কি কাজলকুমারের সম্মান তার চাইতেও বেশী?

পাপিয়া ঠিক সেই ধরণের মেয়ে যাদের উপর-উপর দেখতে ভীষণ ছেলেমানুষ। তার তিন-চার বছর বয়সে তাকে যারা দেখেছে, আজ এই উনিশ বছর বয়েসে যদি তার সঙ্গে তাদের হঠাৎ আবার দেখা হয়ে যায়, চিনতে কোনো অসুবিধে হবে না, কারণ তার ঢলঢলে কাঁচা মুখখানি একটুও বদলায়নি, শুধু তার শরীরটা বেড়েছে। শরীরগঠনের জ্যামিতি নিখুঁত স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও শুধু তার মুখখানির জন্যে তার বয়েস দেখায় অনেক কম। তার সমবয়েসী অন্য মেয়ের মুখ তার মুখের চাইতে অনেক বেশী পাকা। বড়োদের সঙ্গে তার কথা বলার ঢং এখনো সেই ছেলে-বেলাকার মতো আব্দারে-আব্দারে। রাগ হলে এখনো মেঝেতে দুমদাম করে পা ঠোকে। সিঁড়ি দিয়ে নামে নাচতে নাচতে, কথায় কথায় হাসে ঠিক বাচ্চা মেয়ের মতো,—অথচ ন্যাকামো নেই কোনো রকম। এত সরল যে এক নজরেই ভালোবাসে সবাই। মাথার দুপাশে দুটো বিনুনি, কথার তোড়ে সে দুটো দুলতে থাকে। এখনো বিনুনির গোড়ায় দুটো লাল সাটিনের বোও বাঁধে ঠিক স্কুলের মেয়ের মতো। মায়ের অজান্তে রান্নাঘর থেকে টিনের দুধ কি কাঁচা আমের আচার চুরি করে খেতে প্রচুর উৎসাহ। ছাতের উপর খড়ি দিয়ে লাইন কেটে মাঝে মাঝে এক্কা-দোক্কা খেলে এখনো। মেয়ের ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলেন ওর বাবা আর মা।

মেয়ে কি আর বড়ো হবে না কোনোদিন, মা বলেন হাসতে হাসতে।

যদ্দিন ছেলেমানুষ থাকতে পারে থাকতে দাও, উত্তর দেন নীহারবাবু, যখন পরের বাড়ি যাবে তখন কি আর এত সুখে থাকতে পারবে ?

মেয়েকে পরের ঘরে পাঠানোর কথা মনে হলেই মায়ের চোখে জল ভরে আসে।

মেয়ের কাছে মা লুকোতে যায়, কিন্তু মেয়ে টের পায় সব কিছুই। বাইরের ছেলেমানুষির যে খোলস, তার অন্তরালের মনটা অনেক মেয়ের চাইতে অনেক বেশী পরিণত। সংসারের উপর-উপর স্বাচ্ছল্যের আড়ালে যে নানারকম সমস্যার জটিলটা, কিছুই লুকোনো থাকে না পাপিয়ার কাছে। খুব সরল সহজ তার চাউনি, কিন্তু চোখ দুটো খুব গভীর, খুবই সজাগ।

বাড়ি নিজের, কিন্তু মরগেজ করা আছে ব্যাঙ্কের কাছে। তার জন্যে অনেক টাকা বেরিয়ে যায় মাসে মাসে। নীহারবাবু ভালো রোজগার করছেন আজকাল, কিন্তু কিছুদিন আগে শেয়ারের ফাটকায় নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর সঞ্চয়ের অনেকখানি। নীহারবাবুর হার্টের অসুখ আছে, তাই একটু দুর্ভাবনাও আছে মেয়ের জন্যে। ওকে যতো শিগগির পারেন পাত্রস্থ করতে চান।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাপিয়া ভাবতো এত তাড়াতাড়ি তার বিয়ে হবে না। তার যখন ভাই নেই, তখন সে নিজেই লেখাপড়া শিখে রোজগার করবে, মা-বাবা বুড়ো হলে ওদের দেখাশোনা করবে। ইদানিং বুঝতে পারছিলো যে এ হবার নয়, মাকে বাবাকে একথা বোঝানো যাবে না। তার জন্যে যে ঠিকমতো পাত্র পাওয়া যাচ্ছিলো না, এতে প্রথম প্রথম উল্লসিত হলেও, আজকাল আর খুশি হতে পারছে না। তার জন্যে যে তার মা-বাবার দুর্ভাবনা ক্রমশ বাড়তে সুরু করছে, এটা তাকে খুব ব্যথিত করতো।

দীপ্তির সমস্যাও তার বুঝতে সময় লাগলো না। দীপ্তিদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, সংসারে অভাবের চাপ এত বেশী আর দীপ্তির মনের জোর এত কম যে, কঠিন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো শক্তি তার নেই। ভেতর থেকে একটি পলাতক মনোভাব গড়ে উঠেছে। তাই কলেজের নানারকম কাজে পারিবারিক জীবনের অন্ধকার দিকটা ভুলে থাকতে চায়, হৈ-হৈ করে সব সময়, খুব হাল্কা খুব চটুল কথাবার্তা বলে যা সব সময় মেয়েদের মুখে মানায় না।

তারই মতো মেয়ের পক্ষে সিনেমায় নামবার স্বপ্ন দেখা যে খুবই স্বাভাবিক, সে কথা বুঝতে পারলো পাপিয়া।

পাপিয়ার যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু দীপ্তি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল কাজলকুমারের বাড়ি।

গেটের কাছে এ্যালসেশিয়ান ঘেউ-ঘেউ করলো। ছুটে এলো কাজলকুমারের মাসতুতো ভাই সুবিমল। সাধারণত সে অপরিচিত বা অবাঞ্ছিতদের ফিরিয়ে দেয় গেটের বাইরে থেকেই, কিন্তু মেয়ে হলে ভিতরে গাড়ি বারান্দার নিচে গিয়ে দুটো চারটি কথা বলে, নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের অবহিত করবার চেষ্টা করে।

পাপিয়া আর দীপ্তিকে দেখে সে গেট খুলে তাদের গাড়ি বারান্দার নিচে নিয়ে এলো। তাদের নাম জিজ্ঞেস করলো, প্রয়োজন জিজ্ঞেস করলো, তারপর বললো, সোশিয়্যালে প্রধান অতিথি? না, কাজলদার সময় নেই। আমার সময় যদিও বা এক-আধটু আছে, দাদার তো একেবারেই নেই। কবে বলছেন? পনেরো তারিখ? না, কাজল-দার সেদিন আউট-ডোর আছে চিড়িয়াখানায়।

পাপিয়া মনে মনে ভাবলো, বাঁচা গেল। কিন্তু দীপ্তি হার মানবার মেয়ে নয়। জিজ্ঞেস করলো, উনি বাড়ি আছেন?

কেন?

একটু দেখা করবো।

দেখা? অসম্ভব।

শুধু এক মিনিটের জন্যে—।

এক মিনিট? হোঃ-হো। ভগবান দিনকে ছাব্বিশ ঘণ্টা না করে চব্বিশ ঘণ্টা করেছেন বলে কাজল-দা ভগবানে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছে। মহরতের দিন কালীঘাটে পূজো দেওয়া ছাড়া ঠাকুর-দেবতার সঙ্গেও আর কোনো সম্পর্কই রাখে না। আপনাকে সময় দেবে কোত্থেকে? তামসী মজুমদারের নাম শুনেছেন? ওই যে, টেনিসে খুব নাম? এখন তার সঙ্গে টেনিস খেলতে যাবে কাজল-দা।

দীপ্তি একটু ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার মুখ ঝলমল করে উঠলো।

বাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে কাজলকুমার। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। সঙ্গে হ্রস্বতম পোশাক পরা একটি মেয়ে। তারও হাতে টেনিস র‍্যাকেট।

দীপ্তি যখন সুবিমলের সঙ্গে কথা বলছিলো, পাপিয়া হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েছিলো বাগানের দিকে। সেখানে অনেক বড়ো বড়ো ডালিয়া ফুটেছে। তাই দেখছিলো ঘুরে ঘুরে।

কাজলকুমার প্রথমে দেখতে পেলো তাকেই। বাইরে একটু উদ্ধত হলেও মনে মনে খুব ভদ্র। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, কি চান?

কিচ্ছু না, উত্তর দিলো পাপিয়া। আর কিছু না বলে একটি বড়ো ডালিয়া ধরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

একটু অবাক হোলো কাজলকুমার। তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কোনো সাধারণ মেয়ে যে বলে, কিছু চাই না, তারপর তার দিকে না তাকিয়ে অন্য কিছু অবলোকন করে, এ অভিজ্ঞতা তার জীবনে হয়তো এই প্রথম।

এবং এই প্রথম সে একটু ইতস্তত করলো, ভেবে পেলো না কি বলবে।

যে অচেনা মেয়ে তার বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে ডালিয়া পর্যবেক্ষণ করছে, কী বলা যায় তাকে ?

পাপিয়া হয়তো বুঝলো তার অস্বস্তি। বললো, আপনার বাগানে খুব সুন্দর ডালিয়া ফুটেছে। তাই দেখছিলাম।

এমন সহজ ভাবে বললো যে একটু হাসলো কাজলকুমার। তবে তার এনামেল করা মন, মুখে কিছু বললো না।

একটি ছিঁড়ে নেবো ? জিজ্ঞেস করলো পাপিয়া। গোলাপী রঙের মতো ডালিয়া দেখে তার সত্যিই লোভ হয়েছিলো।

কাজলকুমার একবার ভাবলো সে নিজেই তিন-চারটি ডালিয়া চয়ন করে দেবে এই অচেনাকে। তারপরই মনে পড়লো, সে কাজলকুমার। একটু গম্ভীর হয়ে সুবিমলকে ডেকে বললো, এঁকে কয়েকটি ডালিয়া কেটে দে। বলতে বলতে লক্ষ্য করলো আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুবিমলের কাছে। ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ?

ও আমার বন্ধু, উত্তর দিলো পাপিয়া, আমার সঙ্গে এসেছে।

সুবিমল একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললো, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কাজলকুমার এগিয়ে এলো।

বললো, বলুন।

পনেরো তারিখ আমাদের কলেজে সোশিয়্যাল হচ্ছে—, দীপ্তি তাড়াতাড়ি সুরু করলো।

—আমার সময় নেই, উত্তর দিলো কাজলকুমার। কোন্ কলেজ, কিসের সোশিয়্যাল, সেখানে তাকে কি করতে হবে, মেয়েটি কে,—কিছুই জানতে চাইলো না। শুধু বললো, আমার সময় নেই।

কালো হয়ে গেল দীপ্তির মুখ।

কাজল মিত্র গাড়িতে উঠছিলো। দীপ্তি কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

আমায় কিছু বলবেন, কাজলকুমার জিজ্ঞেস করলো মুখ ফিরিয়ে।

দীপ্তি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, শুনছিলাম আপনার বইয়ের জন্যে নতুন আর্টিস্ট খুঁজছেন—।

কাজল দীপ্তির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। তারপর গাড়িতে উঠে পড়ে খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো, স্টুডিওতে আসবেন।

উত্তরের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কাজলকুমারের ঝকঝকে আমেরিকান গাড়ি পথের বাঁকে অন্তর্হিত হোলো।

পাপিয়া দেখলো সুবিমল খুব বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে দীপ্তির কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর খুব নিচু মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি ছবিতে নামতে চান?

॥ পাঁচ ॥

দিন তিন চার পর একদিন পাপিয়ার মা মনোরমা পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, সেদিন তুই পাশের বাড়ি কেন গিয়েছিলি বলতো ?

পাপিয়া শুনে অবাক হোলো। মা জানলো কি করে ? শুনলো পাড়ায় নাকি অনেকেই জেনে গেছে এরই মধ্যে।

এমনি গিয়েছিলাম, পাপিয়া উত্তর দিলো ভাঁড়ার ঘরে আচার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে, দীপ্তি এসেছিলো। সেই টেনে নিয়ে গেল। আমাদের কলেজের মেয়েরা পাশের বাড়ির সেই ভদ্রলোককে সোশিয়্যালে চীফ-গেস্ট করে নিয়ে যেতে চায়।

মনোরমা শুধু বললো, ওখানে আর যাস্‌নে।

পাপিয়া চুপ করে রইলো।

মনোরমা বলে গেল, তুই বড়ো হয়েছিস। এখন একটু বুঝে শুনে চলতে হয়। মন্মথবাবুর ছেলে সুব্রতর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে। আজকাল ভালো ছেলে ঠিকমতো পাওয়া কতো শক্ত। মন্মথবাবু এ-পাড়ার লোক। কোনো কথা ওঁর কানে উঠলে কি ভাববেন বল তো!

পাপিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

সেদিন কাজলকুমারের ভাই না কে যেন, ওই যে সেই ছোঁড়াটি, বললো মনোরমা, ফুল লতাপাতা আঁকা হাওয়াই শার্ট পরে বেড়ায়, সে এসে তোর খোঁজ করেছিলো। উনি ওকে খুব বকাবকি করে ভাগিয়ে দিলেন।

পাপিয়া এবার অবাক হলো। সুবিমল এসে খোঁজ করছিলো ? কেন ?

সেদিন কলেজে যেতে খানিকটা আঁচ পেলো।

কলেজে খুব হৈ-হৈ। কাজলকুমার আসছে তাদের সোশিয়্যালে প্রধান অতিথি হয়ে। শুনে একটু অবাক হলো পাপিয়া।

কি করে সম্ভব হোলো? কাজলকুমার তো সামনেই দীপ্তিকে বলেছিলো তার সময় নেই। ইস্, কি ডাঁট! প্রেসিডেণ্ট আইজেন-হাওয়ারের সময় হতে পারে, কিন্তু কাজল মিত্রের সময় নেই।

দীপ্তি ভুরু নাচিয়ে বললো, দেখলি তো? বলেছিলাম না কাজলকুমারকে আনবো আমাদের সোশিয়্যালে?

কী করে তাকে রাজী করালি?

কী করে আবার? জানিস না, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র? কে বলেছিলো যেন? শেক্স্পীয়ার? না, না, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলো। ভগবান তো আমায় আর কিছু দেননি, শুধু একটুখানি চেহারা দিয়েছেন।

শুনে পাপিয়ার একটু মন খারাপ হলো। কারণ তার নিজের রং ময়লা, চেহারা সুশ্রী আর মিষ্টি হলেও ঠিক সুন্দর বলা চলে না।

মুখে হাসি এনে বললো, বেচারা কাজলকুমার! শেষ পর্যন্ত তোর মুখ দেখে ভুললো? আর লোক পেলো না?

কাজলকুমার নয়,—হাসতে হাসতে উত্তর দিলো দীপ্তি,—ওর ভাই সুবিমল। সে-ই কাজলকুমারকে ধরে পড়ে ব্যবস্থা করে দিলো।—বলতে বলতে দীপ্তির কান দুটো একটু লাল হোলো।

সুবিমলের সঙ্গে তোর আলাপ নেই,—না? বলে গেল দীপ্তি, চমৎকার ছেলে। ওরকম লোফার লোফার দেখতে হলেও মনটা বড়ো ভালো। কতো ভালো ছেলে যে জীবনে কিছু করবার চান্স না পেয়ে আজকাল মনের দুঃখে লোফার হয়ে যায়!—বলে দীপ্তি একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপলো।

পাপিয়া এবার একটু আগ্রহান্বিত হোলো। সুবিমলের গল্প শুনলো দীপ্তির মুখে। তার সঙ্গে সে যে ইতিমধ্যে দু-তিন দিন পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে আইসক্রীম খেয়ে এসেছে সে-সংবাদ জানলো।

সুবিমল যে দীপ্তিকে একদিন স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিলো, সিনেমায় চান্স পাওয়ার একটা সম্ভাবনা যে এসে গেছে দীপ্তির, এ সব নানা খবর জানিয়ে কথাটা আপাতত কাউকে না জানাতে অনুরোধ করলো।

সব বলে টলে দীপ্তি সুবিমল সম্বন্ধে একটা উদার মন্তব্য করে শেষ করলো, ওর মতো ছেলে আজকাল আর দেখা যায় না।

কয়েকদিন পরে একদিন রাত প্রায় ন-টার সময় দীপ্তির বাবা এসে উপস্থিত হোলো পাপিয়ার বাড়ি।

পাপিয়া রাস্তায় পায়চারি করছিলো পাড়ার আর দু-তিনজন মেয়ের সঙ্গে। বাড়ি ফিরে দেখে দীপ্তির বাবা বসে আছেন নীহার বাবুর অফিস ঘরে।

পাপিয়া ফিরে আসতে তাকে ডেকে নীহারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, দীপ্তি কোথায়?

পাপিয়া বিস্ময়প্রকাশ করবার আগেই দীপ্তির বাবা বললেন, ও তো এত রাত করে বাড়ি ফেরে না কোনোদিনই। আর আসে তো শুধু তোমার কাছেই। আর কোথাও বড়ো একটা যায় না আজকাল। আমি ভাবলাম তোমরা নিশ্চয়ই একসঙ্গে পড়াশুনো করছো, তাই একটু রাত হয়ে গেল। ওর মাকে সে কথাই বললাম। কিন্তু ওর মা কিছুতেই মানলো না, আমায় জোর করে এখানে পাঠিয়ে দিলো।

পাপিয়া সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। উত্তর দিলো, ওকে তো আমি এই মাত্র ট্রামে তুলে দিয়ে আসছি।

দীপ্তির বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

পাপিয়া বাড়ির ভেতরে গিয়ে আবার খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে, সোজা চলে গেল কাজলকুমারের বাড়ি। গেট ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখে দীপ্তি আর সুবিমল বাগানের এক কোনে পাশাপাশি বসে গল্প করছে।

পাপিয়াকে দেখে ওরা যেন একটু অপ্রস্তুত হোলো। ওরা

কিছু বলবার আগেই পাপিয়া বলে উঠলো, দীপ্তি, তোর বাবা খোঁজ করতে এসেছিলেন।

তাই নাকি? আশঙ্কিত হয়ে উঠলো দীপ্তি। সে ঘড়িতে সময় দেখলো। ওরে বাবা! সাড়ে ন-টা বাজে এরই মধ্যে? বাবাকে তুই কি বললি?

পিতৃদেবকে আশ্বস্ত করে যে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—সে খবর জেনে দীপ্তি একটু নিশ্চিন্ত হোলো।

তখন সুবিমল বললো দীপ্তি, চলো, তোমায় ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। তাহলে তোমার বাবা বাড়ি ফেরার আগেই পৌঁছে যাবে।

এমন সময় হুশ করে ভেতরে ঢুকলো কাজলকুমারের গাড়ি। তামসী মজুমদার বসেছিলো তার পাশে। ওরা গাড়ি থেকে নামতেই সুবিমল বলে উঠলো, যাক, ট্যাক্সিভাড়াটা বেঁচে গেল। কাজল-দা, তুমি তো আর বেরোবে না।

কে বললে? উত্তর দিলো কাজল, আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার বেরোবো।

আমি মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরবো। গাড়ির চাবিটা দেখি?

কাজলকুমার কিছু জানবার কিছু বুঝবার আগেই সুবিমল তার হাত থেকে গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে, দীপ্তিকে গাড়ির ভেতর ঠেলে তুলে, গাড়ি হাঁকিয়ে অন্তর্ধান করলো।

কাজল বিস্মিত হলেও বিস্ময় প্রকাশ করলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো।

তারপর এদিকে ফিরে পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, ওই মেয়েটি কে?

আমার বন্ধু, দীপ্তি, পাপিয়া উত্তর দিলো।

ও। তারপর ভুরু আধখানা তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

আমি? আমি দীপ্তির বন্ধু পাপিয়া।

ও।

কাজল আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই পাপিয়া গেট পেরিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে কাজল তাকিয়ে রইলো পাপিয়ার যাওয়ার পথের দিকে।

তামসী জিজ্ঞেস করলো, কে এই মেয়েটি ?

দীপ্তির বন্ধু পাপিয়া, হেসে উত্তর দিলো কাজল।

দীপ্তি আবার কে ?

পাপিয়ার বন্ধু, হাসতে হাসতে কাজল বললো।

তামসীও হেসে ফেললো, বললো, তা তো আমিও শুনলাম। কিন্তু ওরা কারা ?

এর বেশী আমি কি করে জানবো বলো, কাজল হাসিমুখে উত্তর দিলো, তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিলো, শুনলাম তুমি তামসী। কিন্তু তামসী কে, সে কথাতো আমায় কেউ বলে দেয়নি।

কপট রোষে তির্যকদৃষ্টি হানলো তামসী মজুমদার। তারপর কাজলের পেছন পেছন বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

তামসী মজুমদারকে ইদানিং প্রায়ই দেখা যেতো কাজল-কুমারের সঙ্গে।

পাড়ার অনেকের মুখেই শোনা গেল তামসী নাকি টেনিস ছেড়ে দিয়ে এবার সিনেমায় নাসবে।

তা নামতে চায় নামুক, বললো পাড়ার এরা আর ওরা আর আরো অনেকে, তাই বলে কি দিনরাত কাজলকুমারের বাড়িতেই পড়ে থাকতে হবে নাকি ? পাড়ার ভেতর কি চলছে এ-সব ? বাইরে ওরা যা খুশি করুক, পাড়ার ভেতর কেন ? এ-সব দেখে শুনে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যাবে !

নানারকম বিরূপ সমালোচনা শোনা গেল তামসী মজুমদার সম্পর্কে। সে নাকি ভালো মেয়ে ছিলো এককালে, এখন কাজল-

কুমারের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। নানারকম নিন্দে শোনা গেল,—তার স্বভাবের নিন্দে, চুল ছাঁটার ধরণের নিন্দে, পোশাক পরিচ্ছদের নিন্দে।

কাজলকুমার যখন পাপিয়াদের কলেজের সোসিয়্যালে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল তামসীকেও। কাছে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের মধ্যে পাপিয়াও ছিলো, তার দিকে কাজলকুমারের চোখ পড়লো না একবারও। অসংখ্য অটোগ্রাফ-খাতা সই করবার পর সে একটা সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ দিলো। দেশ যে এক সময় পিছিয়ে পড়েছিলো, চিত্রাভিনেতাদের লোকে সামাজিক সম্মান দিতে চাইতো না, স্বাধীনতার পর দেশের জনসাধারণের সে সব সংস্কার অনেক মুছে গেছে, এখন যে তরুণ সমাজের সমস্ত উৎসব সমারোহে অন্যান্য বিদগ্ধজনদের চাইতে ছায়াচিত্রশিল্পীর ডাক পড়ে সবার আগে,—এই প্রগতিশীলতা এবং পরিবর্তনের জন্যে আনন্দপ্রকাশ করে, দেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে, ছাত্রী সংঘের কর্ম-কর্ত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে' কাজলকুমার তামসীকে নিয়ে প্রস্থান করলো সোসিয়্যালের সংগীত-অনুষ্ঠান সুরু হওয়ার আগেই।

সোসিয়্যালের শেষে দীপ্তি পাপিয়াকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললো,—জানিস, ওর বইতে আমি একটি মাঝারি রোল পাচ্ছি। বাবা আর মা আপত্তি করেন নি। কাজলকুমারকে বলে সুবিমলই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তুই সুটিং দেখতে যাবি?

না,—উত্তর দিলো পাপিয়া।

কেন?

আমার বিয়ের প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে। এখন আর এখানে সেখানে যাওয়া ভালো দেখায় না। বাবা রাগ করবেন।

বিয়ে করছিস তুই? কবে? এতদিন বলিস নি কেন?—উল্লসিত হয়ে উঠলো দীপ্তি,—ছেলে কি করে? কি নাম?

পাপিয়া চলে যাওয়ার পর দীপ্তি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ইঞ্জিনিয়ার! জার্মানী ফেরত! তার নিজের এরকম হলে মা-বাবা কতো খুশি হতেন!

যাক, সে-সব স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছে দীপ্তি।

ওরকম ভালো ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করবার মতো আর্থিক অবস্থা দীপ্তির বাবার নয়। কতো দুঃখে সে যে ফিল্ম লাইনে যেতে চাইছে সে কথা যদি পাপিয়া বুঝতো!

বাড়ি ফেরার পথে পাপিয়া দু-চার জায়গায় পোস্টারে হোর্ডিংএ কাজল মিত্রের ছবি দেখলো। ভাবলো, হয়তো একদিন দীপ্তির ছবিও দেখা যাবে, তামসী মজুমদারের ছবিও দেখা যাবে।

আর ততদিনে বিয়ে হয়ে যাবে তার নিজেরও।

সেও একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো।

বাড়ি ফিরে অফিস ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলো সেখানে খুব জটলা হচ্ছে। হঠাৎ কাজলকুমারের নাম কানে এলো। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লো পাপিয়া।

সে রীতিমতো একটা সিনেমার দৃশ্য,—একজন বলছিলো,—কাজলকুমার ভদ্রলোককে বললো, আমি কি করবো বলুন, এটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারাই বুঝুন। তখন ভদ্রলোক তামসী মজুমদারের দিকে ফিরে বললো,—তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে কিনা আমি জানতে চাই। তামসী বললো,—না, আমার যখন বাড়ি ফেরার সময় হবে, তখন আমি নিজেই ফিরতে পারবো। ভদ্রলোক তখন কাজলকুমারের দিকে ফিরে বললো,—আপনি কেন তামসীর ভবিষ্যত নষ্ট করছেন? কাজলকুমার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলো,—আমি আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না। আপনি যদি এক্ষুনি চলে না যান, আমি দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হবো। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে গেটের বাইরে চলে এলো, তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে কাজলকুমারকে ইংরেজিতে একটা কুৎসিত

গাল দিয়ে বললো,—আমি এর শোধ নেবো। এমন শিক্ষা দেবো তোমায় যে তুমি জীবনে ভুলবে না। ভদ্রলোকের সে কী চিৎকার চেঁচামেচি। চারদিকের বারান্দায় জানলায় ভিড় হয়ে গেল। কাজলকুমার আর তামসী মজুমদার গায়েই মাখলো না। কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেল। লজ্জায় আমাদেরই মাথা কাটা যায় তখন। ছি-ছি, এ কী কাণ্ড পাড়ার ভিতর! ওদের কিন্তু এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই?

থাক, থাক, পরচর্চায় আর কাজ কি,—নীহারবাবু আলোচনাটা চাপা দিতে চাইলেন, পরচর্চা সমাপ্ত হবার পর। পাপিয়া সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এলো। ওর মা মনোরমা তখন একটা সেলাই নিয়ে বসেছেন। পাপিয়া পাশে বসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো,—পাশের বাড়িতে আজ কি একটা গোলমাল হয়েছিলো শুনছিলাম। কি হয়েছিলো মা?

তা জেনে তোর কি দরকার?—একটু ধমকের সুরে বলে উঠলো মনোরমা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলে পারলেন না। কাজলকুমারের ব্যাপার, চুপ করে থাকা যায় না। কাজলকুমারের ছবি এলে মনোরমা নিজেই না দেখে পারেন না।—ওসব ফিল্ম-স্টারদের নানারকম সব গোলমেলে ব্যাপার। তামসী নামে কে একজন ঘুরে বেড়ায় ওর সঙ্গে। তার সঙ্গে আরেকজন কার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন থেকে। আজ সে এসেছিলো কাজলকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। খুব ঝগড়া হোলো তাদের মধ্যে। কে জানে কি ব্যাপার! গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে এমন ইতরের মতো চ্যাঁচাচ্ছিলো। তারপর লোকজন জড়ো হতে লোকটা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। ও-সব ইঙ্গবঙ্গদের কেচ্ছা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভালো।

মায়ের কাছ থেকে উঠে এসে পাপিয়া চলে এলো নিজের ঘরে। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে জানলার

কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলো, কাজলকুমারের বাড়ির একতলায় এ-ধারের জানলা দুটো খোলা। বসবার ঘরে একটি সোফার উপর পাশাপাশি বসে খুব গল্প করছে কাজলকুমার আর তামসী মজুমদার।

পাপিয়া সরে এলো জানলা থেকে। জামাকাপড় পাল্টে দরজাটা খুলে দিলো। তারপর পড়ার টেবিলে এসে বসলো। টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলো একটি মাসিকপত্র। সেটি উল্টে ছবি দেখতে লাগলো।

এমন সময় বাইরে মায়ের সাড়া পাওয়া গেল। পাপিয়া তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিন লুকিয়ে রেখে একটি পড়ার বই খুলে বসলো।

মনোরমা ঢুকলেন ঘরের ভিতর। কি একটা যেন নিতে এসেছিলেন। সেটি নিয়ে আবার বেরিয়ে চলে গেলেন।

পাপিয়া তখন আবার বই সরিয়ে রেখে মাসিকপত্রের পাতাটা খুললো।

সে পাতায় কাজল মিত্রের একটি বড়ো ছবি।

॥ ছয় ॥

কয়েকদিন ধরে পাপিয়ার মনে হচ্ছিলো তার অটোগ্রাফের খাতায় কাজলকুমারের একটি সই পাওয়া গেলে ভালো হোতো। কিন্তু অটোগ্রাফ খাতা হাতে করে তার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করলো না কিছুতেই। সেই সুবিমলকে ধরতে পারলে কাজটা হয়তো করিয়ে নেওয়া যেতো সহজেই। কিন্তু তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলতেও ইচ্ছে হোলো না। বাবা কিংবা মা জানতে পারলে যে রাগ করবেন সেটা জানা কথা। ভাবলো, অটোগ্রাফ খাতাটা দীপ্তিকে দেবো, সে সুবিমলকে দিয়ে কাজলকুমারের একটি সই যোগাড় করে নেবে। কিন্তু দীপ্তিরও দেখা পেলো না। 'কয়েক দিন ধরে কলেজে আসছে না সে।

একদিন তাকে পার্ক স্ট্রীটে একটি বিখ্যাত বইয়ের দোকানে যেতে হোলো উলের প্যাটার্ণের একটি বই কেনবার জন্যে। বইটা কিনে সে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। বাইরে প্রচণ্ড রোদ্দুর, আর অসহ্য গরম। পাশেই একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অভিজাত রেস্তোরাঁ, আইসক্রীমের জন্যে বিখ্যাত। পাপিয়া ভাবলো, এতদূর যখন এলামই, তখন একটু আইসক্রীম খেয়ে নেওয়া যাক।

সে রেস্তোরাঁয় উঠে এলো। ঘষা-কাচের দরজা ঠেলে খুলে দিলো বিনীত দারোয়ান। এ জায়গায় পাপিয়া একা আসেনি কোনোদিন। শুধু দু-একবার কলেজের দু-তিনজন মেয়ের সঙ্গে এসেছিলো। আজ একা ঢুকতে তার একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই, শুধু এক কোনে একজন ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। এরকম সময় বেশী লোক থাকে না এখানে। পাপিয়ার সঙ্কোচ একটু কমলো। সে ভেতরে ঢুকলো গটগট করে। খানিকটা

এগিয়ে এসে একটি টেবিলে বসে পড়লো। তারপর অর্ডার দিলো একটি আইসক্রীমের।

ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে পাপিয়া একটু পা ছড়িয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, একটু নিঃসঙ্গ মনে হোলো নিজেকে। মনে হোলো, দীপ্তি কিংবা বন্দনা, অথবা চামেলী এরা কেউ সঙ্গে থাকলে ভালো হোতো। বেশ গল্প করা যেতো তাহলে। এমন একলা বসে আইসক্রীম খেলে, বয়-বেয়ারারা কি ভাববে? ওরা দুজন একলা বসে কেমন মনের সুখে গল্প করছে, ভাবতে ভাবতে ওধারের টেবিলের দিকে তাকালো পাপিয়া। তাকাতেই অবাক হোলো সে।—ওই টেবিলে বসে কাজলকুমার আর সেই তামসী মজুমদার!

তখন পাপিয়ার একটু আক্ষেপ হোলো। অটোগ্রাফ খাতাটা সঙ্গে নিয়ে এলেই হোতো। এমন সুযোগ তো সহজে পাওয়া যায় না। একটু ভাবলো পাপিয়া। চোখ পড়লো সগু-কেনা উলের প্যাটার্নের বইটার উপর। মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ভাবলো, এই বইয়ের মলাটে বা ভেতরের পাতায় অটোগ্রাফ নিয়ে নিলে ক্ষতি কি?

সে ভাবলো, উঠে গিয়ে সইটা নিয়ে আসি। উঠতে যাচ্ছিলো, এমন সময় মনো হোলো, এখন যাওয়াটা যেন ঠিক হবে না। ওরা যে নিভৃতে বসে নিজের মনে গল্প করছিলো তা নয়। দুজনেরই মুখ গম্ভীর।

ওরা হয়তো খেয়াল করেনি যে আরেকজন ভেতরে এসে তাদেরই কাছাকাছি বসেছে।

পাপিয়া শুনলো, তামসী বলছে,—আমার আর কিছু বলার নেই।

কাজল মিত্র হাসলো। কি বললো, পাপিয়া শুনতে পেলো না।

তামসীর গলা একটু যেন চড়া। তার কথা পরিষ্কার শুনতে পেলো পাপিয়া!

—তুমি আমার সঙ্গে ছেলেখেলা করছিলে একদিন।

কাজল বসেছিলো পাপিয়ার দিকে একটুখানি পেছন ফিরে। সে হয়তো কোনো উত্তর দিলো না। কিংবা উত্তর দিলেও পাপিয়া শুনতে পেলো না।

আমায় তোমার আর কিছু বলার নেই?—তামসী জিজ্ঞেস করলো।

ঘাড় নাড়লো কাজল। পাপিয়া বেশ মজা পেয়ে গেল। দীপ্তি, বন্দনা, চামেলী আজ থাকলে বেশ হোতো, ভাবলো সে।

তুমি একটা রাস্কেল,—বলে উঠলো তামসী।

পাপিয়ার খুব হাসি পেলো।

তামসী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো,—আমি চলে যাচ্ছি। আর আসবো না।

বেশ যাও।—কাজলের কথাগুলো এবার পরিষ্কার শুনতে পেলো পাপিয়া। তোমায় আমি আসতেও বলিনি, যেতেও বলছি না। তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তুমি এসেছো। এখন তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তুমি চলে যাও।

তামসী আর কোনোদিকে তাকালো না। ব্যাগটা তুলে নিয়ে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে চলে গেল। কাজল ফিরেও তাকালো না, সিগারেট টানতে লাগলো নির্বিকার ভাবে।

ও নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে একটু পরে, পাপিয়ার মনে হোলো তামসীর মুখ দেখে। মাথায় একটা মতলব খেলে গেল হঠাৎ। তামসী ফিরে আসবার আগে উলের প্যাটার্নের বইতে কাজলকুমারের একটা সই করিয়ে নেওয়া যাক না। ও এখন একা বসে আছে। এই তো সুযোগ।

পাপিয়া আস্তে আস্তে কাজলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাজল মুখ নিচু করে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলো। চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো,—কি হোলো? চলে যাবে, আর আসবে না বলছিলে না?

কোনোরকমে হাসি চাপলো পাপিয়া। কিছু বলার আগেই কাজল চোখ তুলে তাকালো। একটু যেন অপ্রস্তুত হোলো সে।

চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠলো কিন্তু আচমকা কোনো কথা বেরোলো না মুখ দিয়ে।

পাপিয়া বললো,—আমায় আপনার একটা অটোগ্রাফ দেবেন?

অটোগ্রাফ!—খুব একটা ক্লান্তির সুরে বললো কাজল। আস্তে আস্তে কলম বার করলো পকেট থেকে।

পাপিয়া উলের প্যাটার্নের বই সামনে রাখলো।

এখানে?—অবাক হয়ে তাকালো কাজল। তারপর হেসে ফেললো। বললো,—পাপিয়ার বন্ধু দীপ্তি, সেই দীপ্তির বন্ধু পাপিয়া, তার অটোগ্রাফের খাতা আর জুটলো না, শেষ পর্যন্ত একটি উলের প্যাটার্নের বই?

অটোগ্রাফের খাতাটা বাড়ি ফেলে এসেছি,—একটু লজ্জা পেয়ে পাপিয়া বললো।

—বেশ তো, একদিন অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়েই আসবেন।

—আপনাকে তো সব সময় পাওয়া যায় না।

—সকালের দিকে আসবেন।

আচ্ছা,—বলে চলে আসছিলো পাপিয়া। কিন্তু কাজল বললো, —চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন।

পাপিয়া অবাক হয়ে কাজলের দিকে তাকালো। বিখ্যাত ফিল্মস্টার কাজলকুমার তাকে বসতে বলছে!

না, আমি যাই,—বললো সে। আমি অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে একদিন আসবো।

কাজলের মুখ একটু ম্লান হোলো। বললো,—দেখুন, আপনাকে বসতে বললাম, অন্য কোনো কারণে নয়। আমি এখানে এসেছিলাম আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে। তাড়াতাড়িতে মানিব্যাগটা ফেলে এসেছি। আমার বন্ধুও হঠাৎ উঠে চলে গেছে। সে আর আসবে না। এখন আমি কি করে বিল মিটিয়ে দিই? শুধু কফি নিয়েছি, কিন্তু কফির দাম মিটিয়ে দেওয়ার মতো সম্বলও আমার সঙ্গে নেই। কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না,—না?

পাপিয়া খুকখুক করে হেসে উঠলো। ব্যাপারটা বন্ধুদের কাছে বেশ রসিয়ে গল্প করার মতো। পাপিয়া বললো,—আমার কাছেও খুব বেশী কিছু নেই, তবে আমি কফির দামটা আপনাকে ধার দিতে পারি।

না, না, ধার নয়,—উত্তর দিলো কাজল,—আমি কারো কাছ থেকে ধার নিই না। ধরে নিন, ওটা আমার অটোগ্রাফের দাম। রাজী?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তা-হলে, ওই চেয়ারটা টেনে বসে পড়ুন। আমি বেয়ারাকে বলে দিচ্ছি, আপনার আইসক্রীম এখানে এনে দেবে।

পাপিয়া আপত্তি করতে পারলো না। খুব অবাকও হোলো মনে মনে। কাজলকুমারের মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তাকে নিজের টেবিলে বসতে বলছে? এ লোভ সামলাতে পারলো না পাপিয়া। যাক, একদিন একটুখানি বসে গল্প করলে ক্ষতি কি, ভাবলো সে। চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

পাপিয়ার বন্ধু দীপ্তি, সেই দীপ্তির বন্ধু পাপিয়া,—নিজের মনে আস্তে আস্তে আউড়ে গেল কাজল, তারপর হেসে ফেললো।

একটু লজ্জা পেলো পাপিয়া। সে-ও হাসলো। বললো,—আমায় আপনি মনে রেখেছেন?

কাজল উত্তর দিলো,—সাধারণত শুনি এই মেয়েটি অমুক দত্ত, ওই মেয়েটি অমুক চৌধুরী, সেই ভদ্রমহিলার নাম অমুক মৈত্র। এত শুনি, আর এত একঘেয়ে লাগে যে শোনবার পরই ভুলে যাই, একটুও মনে থাকে না। কিন্তু আপনার পরিচয় পাওয়ার ধরণটা একটু অন্যরকম। আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গের মেয়েটি কে? আপনি বললেন—ও আমার বন্ধু দীপ্তি। তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি কে? উত্তর দিলেন,—আমি দীপ্তির বন্ধু পাপিয়া। এই পরিচয় ভোলা যায় কখনো?

দুজনেই হাসতে লাগলো খুব। পাপিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল।

ঠিক এমন সময়, যখন পাপিয়া আর কাজল খুব হাসছে, আর লাল হয়ে গেছে পাপিয়ার মুখ,—ঠিক এমন সময়, আস্তে আস্তে ফিরে এলো তামসী মজুমদার। কাছে এসে অবাক হয়ে দেখলো, কাজলের সঙ্গে বসে আছে সেই মেয়েটি, যাকে সে একদিন দেখেছিলো কাজলের বাড়ির গেটের কাছে। দেখলো, দুজনে খুব হাসছে, আর লাল হয়ে গেছে পাপিয়ার মুখ।

এই যে এসো,—হাসতে হাসতে কাজল বললো,—আমার মনে হচ্ছিলো তুমি ফিরে আসবে। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু তামসী,—আর ইনি আমার বন্ধু পাপিয়া।

তামসী পাপিয়ার দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো কথা বললো না।

পাপিয়া হয়তো সৌজন্যের খাতিরে হাত দুটো তুলে নমস্কার করতো, কিন্তু তামসীর দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সে চুপ করে রইলো।

আমি এসেছিলাম বিলটা দিয়ে দিতে,—তামসী আস্তে আস্তে বললো, হঠাৎ মনে পড়লো, তুমি বলছিলে তোমার মানিব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছো।

কাজল আস্তে আস্তে পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে দেখালো। তারপর বললো,—এমনি বলেছিলাম। আমায় নিঃসম্বল দেখলে তোমার মুখে কি রকম আনন্দ ফুটে ওঠে সেটা দেখবার জন্যেই বলেছিলাম।

তামসী কি যেন বলতে গেল, বলতে পারলো না, শুধু ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠলো। সে একবার তাকালো পাপিয়ার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

বাঁচা গেল,—বলে কাজল সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো। পাপিয়া গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলো।

কাজল তার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলো। জিজ্ঞেস করলো,—কি হোলো? ওরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?

আপনি আমায় বসতে না বললেই ভালো হোতো,—উত্তর দিলো পাপিয়া।

—আপনি না বসলে আমি খুব বিপদে পড়তাম। ও এসে বসতো তা-হলে।

একটু চুপ করে থেকে পাপিয়া বললো,—আমায় মিছে কথা কেন বললেন ?

—কি মিছে কথা ?

—আপনার ম্যানিব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছেন ?

—তা নইলে কী বলতাম ? আপনাকে চিনি না, জানি না, এমনি বসতে বললে, আপনি বসতেন ?

বয়েস আরেকটু বেশী হলে ঠিক-ঠিক উত্তর দিতে পারতো পাপিয়া, কিন্তু তার বয়েস কুড়ি পেরোয় নি, কৈশোরের সরলতা চলে যায়নি এখনো। কাজলের কথার ধরণ তার ভালো লাগলো না। কিন্তু তার এই ভালো না-লাগাটা সে অন্য কোনো ভাবে প্রকাশ করতে পারলো না। শুধু বললো,—আমি এবার যাই।

—না, এখন নয়। আরো একটু পরে।

—না।

—আরেকটু বসলে ক্ষতি কি ?

—না, এবার আমি যাবো।

পাপিয়া উঠতে যাচ্ছিলো। কাজল আস্তে আস্তে বললো,—আমাদের একটা এগ্রিমেণ্ট হয়েছিলো।

পাপিয়া চোখ তুলে তাকালো কাজলের দিকে।

—কি এগ্রিমেণ্ট ?

—আপনি আমার কফির বিলটা দিয়ে দেবেন, আমি আপনার অটোগ্রাফ খাতায় আমার সই দেবো।

পাপিয়া একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। হেসে ফেললো সে।

কাজল আস্তে আস্তে বললো,—আমার সঙ্গে দুমিনিট বসে

গল্প করবার সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে ভারতবর্ষের লাখ লাখ মেয়ে।

পাপিয়া চুপ করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না। কাজলের কথাবার্তা যে তার ভালো লাগছে না তার মতো সরল অল্পবয়েসী মেয়ের পক্ষে সেটা জানানোর একমাত্র উপায় কাজলের কথার কোনো উত্তর না দেওয়া। তাই চোখ নিচু করে রইলো পাপিয়া।

কাজলও বুঝলো। কিন্তু গায়ে মাখলো না। বললো,—আপনি আমার পাশের বাড়িতে থাকেন?

কে বললো?—নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞেস করলো পাপিয়া।

—আমি জানলা দিয়ে আপনাকে দেখেছি।

তাহলে ফিল্ম-স্টারেরাও জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েদের দিকে উঁকি মেরে তাকায়! পাপিয়ার হাসি পেলো। হাসি চাপতে পারলো না। হেসে ফেললো সে। তারপর মনে হোলো—না, তার হাসা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন এ লোকটার কথাবার্তার ধরণ তার ভালো লাগছে না। সে আবার মুখ গম্ভীর করলো।

—আপনি আমার প্রতিবেশী বলেই আমি নিজে সেধে আপনার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করছি। তা নইলে এই কলকাতা শহরে কে কার খবর নেয়? আপনার পুরো নামটা কি, বলুন তো?

—কেন?

—আলাপ-পরিচয় করা যাক। চিরকাল অন্য সবাই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে। আজ না হয় আমিই সেধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলাম।

তিন চারজন মেয়ে আর ছেলে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলো। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়, পাঞ্জাবী নয় সিন্ধী। ওরা একটি টেবিলে বসতে না বসতেই কাজলকুমারকে চিনতে পারলো। ফিস-ফিস করলো এ ওর কানে। ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো বার বার। মেয়েরা ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো পাপিয়ার

দিকে। পাপিয়া তাকালো তার নিজের শাড়ির দিকে। খুব সাদাসিধে তাঁতের শাড়ি তার পরনে, খুব সাদাসিধে প্রসাধনবিহীন তার মুখ। ফিল্ম-স্টারদের সঙ্গে যাদের প্রত্যাশা করা যায় তাদের শ্রেণীর একেবারেই নয় পাপিয়া।

সে মনে মনে খুব গর্ববোধ করলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন একটু খুশীও হোলো।

আস্তে আস্তে বললো,—আমার নাম পাপিয়া চাটার্জী।

কাজল তাকিয়ে দেখলো পাপিয়াকে। তার মুখ দেখে নিজের বাগানের ডালিয়াগুলোর কথা মনে পড়লো। বললো,—কেন এরকম মিষ্টি নাম রেখেছেন আপনার বাবা? আমার রাগ হচ্ছে ওঁর উপর।

—কেন? সরল চোখ দুটো তুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো পাপিয়া।

কাজল হাসলো। আস্তে আস্তে বললো,—যার অমন মিষ্টি নাম, পাপিয়া, তাকে তো মিস মুখার্জী বলে ভাবা যায় না। তাকে নাম ধরে ডাকতে হয়।

নাম ধরে ডাকবে? আহ্লাদ দেখ না! রাগ হোলো পাপিয়ার। উত্তর দিলো,—যদি নাম ধরেই ডাকবেন তো পাপিয়াদি বলে ডাকবেন!

পাপিয়া দি-ই-ই-ই—! চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজল তাকালো। তারপর একটু হাসলো।

—বয়েস কতো? —জিজ্ঞেস করলো সে।

—আমার? —পাপিয়া উত্তর দিলো,—দেখে:যা মনে হয় তার চাইতে অনেক বেশী।

—দেখে তো মনে হয় তিরিশ পেরিয়ে গেছে।

পাপিয়া হেসে ফেললো। বললো,—তিরিশ? যেদিন আমার তিরিশ হবে, তার অনেক আগেই সিনেমার দর্শকেরা আপনার নাম ভুলে যাবে।—বলতে বলতে তার মনে হোলো যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এবার তার যাওয়া উচিত।—থাক, আমি এবার যাই।

পাপিয়ার উত্তর শুনে কাজল হাসতে হাসতে বললো, বসুন।

সে ঠিক সেই হাসি হাসতে হাসতে বললো, যে হাসি রুপালী
বাম্বে কলকাতা দিল্লীর মেয়েরা রাত্তিরে
পারে না, যে হাসি তাকিয়ে দেখতে দেখতে সেই রেস্তোঁরার আশ-পাশের টেবিলের অন্যান্য সবাই ভুলে গেল যে তাদের আইসক্রীম গলে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তাদের কফি।

যে সহজ বুদ্ধিতে খরগোস হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে, আশ্রয় নিতে চায় নিজের বিবরে, সেই সহজ বুদ্ধিতে পাপিয়ার মনে হোলো এখানে আর বেশীক্ষণ বসা ঠিক হবে না।

না, আমি যাই—।

বোসো।

খুব ধীর, খুব গম্ভীর শোনালো কাজলের গলা, কথাটা যেন বেজে উঠলো নিরালা দুপুরে নির্জন কক্ষে ঠাকুরদার আমলের ঘড়ির মতো।

পাপিয়ার মন একটু দুলে উঠলো, তবু রাগ হোলো। বোসো! বসুন নয়, একেবারে বোসো? অচেনার সঙ্গে প্রথম আলাপেই তুমি?

কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলো না। চুপ করে বসে রইলো। মনে মনে ভাবলো, আমার বয়েস যদি আর একটু বেশী হোতো ওকে কষে একটা ধমক দিতাম।

তুমি কি করো?

পড়ি। এবার বি-এ দেবো।

তা হলে তোমার বয়েস, কাজল হিসেব করলো, আঠারো-উনিশের বেশী নয়। আমার বয়েস কতো জানো? প্রায় চৌত্রিশ।

অতো? পাপিয়া অবাক হয়ে তাকালো। সেদিন যে এক জায়গায় পড়লাম আপনার বয়েস সাতাশ?

সিনেমা-ম্যাগাজিনে তো? ওখানে ওরকম ছাপার ভুল মাঝে মাঝে হয়।

আপনার বয়েস যাই হোক, আমার তাতে কি?—বিনুনি দুলিয়ে পাপিয়া বললো,—পয়সা দিয়ে সিনেমায় আপনার বই দেখি, যদ্দিন ভালো লাগে দেখবো, যেদিন ভালো লাগবে না, দেখবো না।

—ভালো লাগে?

আপনার পার্ট? কক্ষনো না। আমি যাই শুধু দীপাকুমারীর অভিনয় দেখতে, যার সঙ্গে ভালো জোড় মেলে বলেই আপনাকে নিয়ে এত হৈ-হৈ। অভিনয় করতে আপনি জানেন না। শেখবার সুযোগ পাননি বোধ হয়।

—ম্। কাজল মিত্র তার সিগারেট ছাইদানে নিভিয়ে রাখলো। আস্তে আস্তে বললো,—তুমিই প্রথম। আর কোনো মেয়ে আমায় একথা বলেনি কোনোদিন।

ওরা আপনার সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলবার সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। আমি দেখিনা। আচ্ছা, আমি এবার যাই।

—না।

—হ্যাঁ। বাবা বকবে।

বাবা বকবে?—কাজল মিত্র হেসে ফেললো,—আমায় আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি বাবা বকবে।

—আমার বাবা বকবে।

—না, বকবে না।

হ্যাঁ, বকবে। চেনাশোনা কেউ দেখে ফেললে মুশকিল, আপনাকে তো সবাই চেনে।

পাপিয়ার কথা শুনে কাজল চুপ করে একটু ভাবলো। সকাল বেলার টাটকা ফুলের মতো মনে হলো তাকে। তার সঙ্গে বসতে চাইছে না একটি মেয়ে, তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। খুব নিচু গলায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, আমি যদি সবার অচেনা হতাম? যদি আমি ফিল্মআর্টিস্ট না হয়ে কোনো মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী হতাম? তাহলে আমার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ বসতে?

মাথা নেড়ে খুব সহজভাবে উত্তর দিলো পাপিয়া,—নিশ্চয়ই বসতাম। খুব খুশী হতাম তাহলে, কতো সহজভাবে কথা বলতে পারতাম আপনার সঙ্গে। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে কথা বলাই বিপদ—একটু যেন ছেলেমানুষী অভিমানের সুর অনুভূত হোলো পাপিয়ার গলায়,—আপনাদের তো মাথায় ঢুকে বসে আছে যেহেতু আপনারা নামকরা ফিল্মস্টার, দুনিয়ার সবাই আপনাদের কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার জন্যে হাঁ করে বসে আছে।

অনেকেই সত্যি সত্যি হাঁ করে বসে আছে কিন্তু,—খুব তরল গলায় কাজল বলে উঠলো।

কক্ষনো না,—বলে পাপিয়া ছোট্টো একটি ঘুষি বসালো টেবিলের উপর,—একজনও নেই। ফিল্মস্টার ওই দূর থেকেই ভালো, কাছে পাওয়ার জন্যে মার্চেন্ট অফিসের কেরানীর অনেক বেশী দাম। পাঁচ সিকে খরচা করলে রুপালী পর্দায় ফিল্মস্টারকে দেখা যায়, কিন্তু দেড়শো টাকা মাইনের কেরানীকে পেতে হলেও বেশ কয়েক হাজার টাকা পণ দিতে হয়।

হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল কাজল মিত্র। আর একটি সিগারেট ধরালো। তারপর বললো,—চলো, এবার যাওয়া যাক।

বাড়ি ফিরে এসে পাপিয়া দেখলো দীপ্তি বসে আছে তার জন্যে।

ভাবলো, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার সময় ভাগ্যিস মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি, কারণ সে ঠিক করে রেখেছিলো মা যদি জিজ্ঞেস করে সে কোথায় ছিলো এতক্ষণ, সে বলবে—দীপ্তিদের বাড়ি বসে গল্প করছিলাম।

কোথায় গিয়েছিলি তুই ?—জিজ্ঞেস করলো দীপ্তি।

—বন্দনাদের ওখানে।

—সে কি ? আমি যে ওখানে ফোন করতে ওরা বললে বন্দনা বাড়ি নেই।

—ওর সঙ্গে মার্কেটে গিয়েছিলাম।

—ওর মা যে বললেন বন্দনা একাই বেরিয়েছে ?

ওদের বাড়ি অবধি যাই নি। ওদের বাড়ি পৌঁছানোর আগে পথেই বন্দনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেশ গরম পড়েছে ইদানিং, না ?—প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার চেষ্টা করলো পাপিয়া।

মার্কেটে কি কিনলি ?—জিজ্ঞেস করলো দীপ্তি।

—বিশেষ কিছু নয়। পাটনা থেকে তোর পিসীমার আসবার কথা ছিলো না ? উনি কবে আসছেন ?

—তু-একদিনের মধ্যেই। তোরা মার্কেটে গেলি তো আমায় ডেকে নিলি না কেন ?

—বন্দনার একটু তাড়া ছিলো। তোর সেই সুবিমলবাবুর খবর কি ?

সুবিমল ?—দীপ্তির চোখ একটু আবেশময় হলো। ভুলে গেল বন্দনার সঙ্গে পাপিয়ার মার্কেটে যাওয়ার প্রসঙ্গ। পাপিয়া মনে মনে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দীপ্তি বললো,—মাসীমা এসে পড়বেন না তো ? তোকে অনেক কথা বলবার আছে।

পাপিয়া দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

একটু পরে মনোরমা চা আর খাবার নিয়ে এলেন। দেখলেন দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে হাসির সাড়া এলো।

ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,—দরজা বন্ধ করে তোরা কি করছিস ? চা নিয়ে এসেছি তোদের জন্যে। দরজা খোল।

—যাই।

পাপিয়া উঠে দরজা খুলে দিলো। মনোরমা ঘরে ঢুকে দেখলেন টেবিলের উপর বই আর নোটখাতা খোলা পড়ে আছে।

একটু পড়াশুনো করছিলুম,—পাপিয়া বললো।

মনোরমা চা দিয়ে চলে যেতে পাপিয়া আবার দরজা ভেজিয়ে দিলো। তুজনে হাসলো খুব।

—তারপর ?

—তারপর !

—তারপর সুবিমল কি বললে ?

—যাঃ, আর বলবো না।

অনেকক্ষণ গল্প করবার পর পাপিয়া দীপ্তিকে নিচে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিলো।

দীপ্তি বললো—ভাই, এ যে কি জিনিস, কী অদ্ভুত ভালো যে লাগে তোকে বলে বোঝাতে পারবো না। নিজের না হলে এ কোনোদিন কাউকে বোঝানো যায় না। আচ্ছা, সত্যি তুই কোনো-দিন কারো প্রেমে পড়লি না কেন ? আমাদের পাশের বাড়ির সুজাতাদির ভাসুরপো কদ্দিন আমায় বলেছে তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। আলাপ করবি একদিন ? চমৎকার ছেলে। তোর খুব ভাল লাগবে।

পাপিয়া একটু হেসে উত্তর দিলো,—দু-দিন পরে আমার বিয়ে হয়ে যাবে, ভদ্রলোককে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে কী লাভ।

দীপ্তিও হেসে ফেললো। বললো—সুবিমল বলেছে একদিন তোকে আর আমাকে নিয়ে-বটানিক্‌স্‌এ যাবে। কবে তোর সুবিধে হবে জানাতে বলেছে।

কিছুক্ষণ পর দীপ্তি চলে গেল।

ফিরে আসবার সময় পাপিয়া আসছিলো নীহারবাবুর অফিস ঘরের পাশ দিয়ে। হঠাৎ মন্মথবাবুর গলার সাড়া পেলো !

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পরে একটু শুনলো পাপিয়া। নীহার-বাবু আর মন্মথবাবু ওর বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন।

পাপিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। সে আস্তে আস্তে উপরে চলে গেল।

দিন তিন-চার কেটে গেল। কাজলের গাড়ি পাপিয়ার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকবার। তাকে সে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হোলো না।

পাপিয়া তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে তুচারজন পথচারী-পথচারিণীর দিকে। দেখলো, ওরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে কাজল মিত্রের গাড়ির ধুলো দেখছে।

কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে পাপিয়া চৌরঙ্গি পাড়ায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলো একদিন। সিনেমার পর গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে দিয়ে হেঁটে আসবার সময় দেখলো, কাজল মিত্র ফুটপাথ পেরিয়ে হোটেলে ঢুকছে।

বন্ধুটি জানতো না কাজল পাপিয়াদের পাড়ায় থাকে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো,—গ্যাখ, গ্যাখ, কে যাচ্ছে। বোম্বের কাজলকুমার।

এপাশে ওপাশে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলো দর্শনবিমুগ্ধ ভক্তের মতো। একটা মৃত্ন শোরগোল কাজলের কানে গেল হয়তো। কিন্তু সে কোনোদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো না। তাড়াতাড়ি হেঁটে ভিতরে চলে গেল।

কাজলকুমারকে দেখলি ?—জিজ্ঞেস করলো পাপিয়ার বন্ধু।

পাপিয়া ময়দানের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে একটু হাসলো।

॥ সাত ॥

দিন কয়েক পর একদিন পাপিয়া বটানিক্‌স্‌এ বেড়াতে গেল দীপ্তি আর সুবিমলের সঙ্গে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠলো। বেশির ভাগ সময় কাজল মিত্রের কথা, বম্বের শবনমকুমারী, দীপাকুমারীর কথা, সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের গল্প।

সেদিন মাঝ-হপ্তার দিন। লোকজন খুবই কম।

দীপ্তি আর সুবিমল পাপিয়াকে কাজলকুমারের সম্বন্ধে নানারকম চুটকি গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ডাব খেতে গেল। পাপিয়া গেল না। সে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিজের মনে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য তারিফ করছিলো বোধ হয়,—

এমন সময় আচমকা বৈশাখী ঝড়ের মতো একটি গাড়ি এসে তার পাশে ব্রেক কষে হঠাৎ থেমে গেল।

—আপনি এখানে কি করছেন?

কাজলের গলা শুনে পাপিয়া ফিরে তাকালো। বললো,—বেড়াতে এসেছি। আপনি কি করছেন?

আমি?—কাজল একটু ভাবলো। তারপর বললো,—এখানে আমার একজন বন্ধুর আসবার কথা ছিলো। তাই এলাম। এসে খেয়াল হোলো যে আসবার কথা তো আজ নয়, কাল। ভাবছিলাম, এখন একা একা কি করি? আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হোলো। চলুন কোথাও গিয়ে কাবাব খেয়ে আসি।

পাপিয়া জানালো যে তার সঙ্গে অন্য লোক আছে। এবং তা নাও বা যদি থাকতো, যার তার সঙ্গে কাবাব খেতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজলের মুখ হঠাৎ শাদা হয়ে গেল।

পাপিয়া আঙুল দিয়ে ডাবওয়ালার কাছে সুবিমল আর দীপ্তিকে দেখিয়ে দিলো।

ও,—হাল্কা সুরে বললো কাজল,—ওরা? ওদের সঙ্গে এসেছেন? হারুকে আপনি চেনেন নাকি?

—হারু? ভুরু তুললো পাপিয়া।

—মানে, যাকে আপনারা সুবিমল বলে জানেন। আমি ওকে ছেলেবেলা থেকেই হারু বলে ডেকে আসছি, তাই এখনও হারু বলি। ওই মেয়েটি আপনার বন্ধু, না? ওরই সঙ্গে তো আপনি আমার বাড়ি প্রথম এসেছিলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন!

আমি ওদের সঙ্গে এসেছি,—খুব শান্ত গলায় বললো পাপিয়া।

—এখন আমার সঙ্গে ফিরবেন। ওরা কিছু মনে করবে না। মনে হচ্ছে, ওদের এখানে একলা রেখে গেলে ওরা খুশিই হবে। আমি হারুকে ডেকে বলে দিচ্ছি। আপনি গাড়িতে উঠুন তো!

পাপিয়া ভাবতেই পারলো না এভাবে তাকে কেউ বলতে পারে। বুঝতেই পারলো না কখন সে গাড়িতে উঠে পড়েছে। খুব রাগ হচ্ছিলো কাজলের উপর। এমন ঝড়ের মতো তার ব্যবহার যে তার সামনে মাঝে মাঝে নিজেকে শুকনো পাতার মতো মনে হয়।

কাজল গাড়িতে স্টার্ট দিলো। কিন্তু হারুকে ডেকে কিছু বললো না। ওরা ফিরে তাকাতে শুধু ওদের দিকে হাত নেড়ে গাড়ি নিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল।

সুবিমল আর দীপ্তি ডাব হাতে অবাক হয়ে একবার দূরান্ত গাড়ির দিকে, তারপর পরস্পরের দিকে তাকালো।

গাড়ির ভিতর বসে পাপিয়া রাগে ফুলতে লাগলো। বললো,—ওরা আমায় কি ভাবছে বলুন তো? আমি আর কক্ষনো আপনার সঙ্গে আসবো না।

কাজল হাসতে লাগলো।

—আপনি হাসছেন?

—আপনার সঙ্গে আর কক্ষনো আসবো না, একথা আমি অনেকের মুখে অনেক শুনেছি।

পাপিয়া গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো,—আমায় এসপ্লানেডে ছেড়ে দেবেন। আমি ওখান থেকে ট্রাম ধরে বাড়ি চলে যাবো।

—এসপ্লানেড এখনো অনেক দূর।

পাপিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

কাজল বলে গেল,—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার অনেক উপকার হোলো। আপনাকে তখন বলিনি। বললে আপনি কিছুতেই আসতেন না। আমার সঙ্গে আরেকজন মহিলা ছিলেন। তিনি বড্ড বেশী মেজাজ দেখাচ্ছিলেন আমায়। মেজাজ দেখিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন এক সময়। ভেবেছিলেন হয়তো আমি তাঁর পেছন পেছন গিয়ে সাধাসাধি করবো। আমি দেখলাম কাছেই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এলাম।

কাজলের কথা শুনে পাপিয়ার মুখ রাগে রাঙা হয়ে গেল।

—আপনার আস্পর্ধাতো কম নয়। গাড়ি থামান। আমি এক্ষুনি নেমে যাবো। এখানেই।

কাজল গাড়ি থামালো না। কোনো উত্তরও দিলো না।

পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো।

অনেকক্ষণ পর, হাওড়ার পুল পেরিয়ে, স্ট্র্যাণ্ডরোড ধরে অনেকটা গিয়ে, আউটরাম ঘাট পেছনে রেখে, চাঁদপাল ঘাটের কাছাকাছি এসে কাজল গাড়ি দাঁড় করালো পথের এক পাশে।

পাপিয়া চারদিক পর্যবেক্ষণ করে একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো,—আপনি কি চান আমি এখান থেকে চৌরঙ্গি হেঁটে যাই?

না, আমি চাই আপনি মিনিট দশ পোনেরো আমার সঙ্গে বসে গল্প করুন,—উত্তর দিলো কাজল,—তারপর আমার সঙ্গে

কোথাও বসে কাবাব-পরটা খাবেন, তারপর আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেবো। আচ্ছা সেদিন আমি তোমায় তুমি-তুমি করে কথা বলছিলাম, আজ কেন আপনি করে বলছি? তোমার নামটা কি যেন? ভুলে গেছি।

পাপিয়া ঠোঁট কামড়ে বসে রইলো।

—দাঁড়াও মনে করে দেখি। হ্যাঁ, কি যেন একটা পাখির নাম। কোয়েল? দোয়েল? না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কাকাতুয়া।

পাপিয়া মুখ না ফিরিয়েই একটু হাসলো, বললো,—আচ্ছা, আমায় কি ছোটো বাচ্চা মেয়ে পেয়েছেন?

—তুমি আমার এত ছোটো যে আমার কাছে তুমি একটি ছোট্টো বাচ্চা মেয়ে বই কিছু নও।

পাপিয়া এবার মুখ ফেরালো। খুব শান্ত, সরল, সহজ, স্নিগ্ধ তার চোখ দুটো। স্থির গলায় আস্তে আস্তে বললো,—দেখুন, আপনি খুব এক্‌স্‌পার্ট, বুঝতেই পারছি। আপনার ভাব করার টেকনিক বদলায় লোক বুঝে। আমি আপনাকে ঠিক দু-মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আপনি আমায় চৌরঙ্গিতে পৌঁছে না দেন, তাহলে আমি এখান থেকে হেঁটেই চলে যাবো। আপনি এদ্দিন যে ধরণের মেয়ে দেখে এসেছেন, আমি ঠিক সে রকম নই।

কাজল চুপচাপ একটি সিগারেট ধরালো। তারপর আস্তে আস্তে ভারী গলায় বললো,—সেকথা আমি জানি, পাপিয়া। তুমি অন্য-রকম, একেবারে অন্যরকম। আমি যাদের জানি, তারা চেনে শুধু দুরন্ত জীবন, অর্থের প্রাচুর্য আর শহরের উপরতলার জীবনের বিলাসব্যসন। ওরা জানে আমার অনেক টাকা, এক একটা হিন্দি বইতে আমি লাখখানেক করে পাই। সেটাই ওদের কাছে আমার প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু তুমি অন্যরকম। তুমি খুব সহজ। তুমি খুব ভালো। আমার বইয়ের ফুল-হাউসে একটি পাঁচ সিকের টিকিট পেয়ে গেলেই তুমি খুব খুশী। তার বেশী তুমি চাওনা।

তুমি এত সহজ, এত সাধারণ যে একটি আরো সাধারণ ছেলেকে বিয়ে করে ঢাকুরিয়া বা যাদবপুরে একটি তিন-কামরার ঘর সস্তা ভাড়ায় পেয়ে গেলে তুমি খুশী, আর তার সঙ্গে প্রত্যেক রোববারে সিনেমায় যেতে পারলে তুমি আর কিছু চাইবে না। সিনেমায় গিয়ে তুমি আর সে দেখবে আমি গান গাইছি, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, ছিনিমিনি খেলছি দর্শকের হাসি আর চোখের জল নিয়ে। তোমার পাশে বসে সেই সাধারণ ছেলেটি তোমারই সঙ্গে খুব হাসবে, ইন্টারভ্যালে তোমায় পান কিনে এনে দেবে, কাজু বাদাম কিনে দেবে, আর কোনোদিন জানবে না যে গঙ্গার ধারে বসে একদিন আমি তোমায় দু-মিনিট বসে আমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে সাধাসাধি করেছিলাম।

পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে শুনছিলো, এবার এদিকে মুখ ফেরালো। হেসে উঠলো সে। বললো—বাঃ, কী সুন্দর ডায়ালগ্। ঠিক এমনি,—ঠিক এমনি করেই আপনি বলেন পর্দার উপর, আর শুনতে আমাদের কী যে ভালো লাগে!

কাজল কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলো পাপিয়ার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো,—তোমরা মনে করো আমরা সব সময় অভিনয় করি, না?

না, তা ভাবি না,—পাপিয়া উত্তর দিলো,—অভিনয় করতে করতে হয়তো আপনাদের সহজ সাধারণ কথাগুলো বলবার ধরণই এরকম হয়ে গেছে।

—আমি সত্যি কথাই বলছি পাপিয়া। তোমরা যেমনি আমাদের দূর থেকে দেখ, আমরাও তোমাদের ঠিক তেমনি দূর থেকেই দেখি। পথে ঘাটে যখন দেখি কোনো মেয়ে আর কোনো ছেলে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে সহজভাবে হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে, ভীষণ হিংসে হয় তখন। মনে হয়, যদি আমিও পথ দিয়ে ওরকম সহজভাবে হেঁটে যেতে পারতাম, ওরকম সাধারণ মেয়ের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারতাম! যখন দেখি ট্রামে বাসে

লোকে গল্প করতে করতে যাচ্ছে, তখন আমারও ইচ্ছে করে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ট্রামে বাসে চড়তে।

—চড়েন না কেন ?

—উপায় নেই পাপিয়া। আমি এক হতভাগ্য ফিল্মস্টার, গাড়ি ছেড়ে পথে নামলেই রাস্তায় ভিড় জমে যাবে, সাধারণ রেস্তোঁরায় ঢুকলে লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ালে সবাই অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে ছুটে আসবে। তোমরা সাধারণ মানুষেরা কী সুখে আছো! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ফিল্মে অভিনয় করা ছেড়ে দিয়ে কোনো দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান হয়ে যাই।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,—পাপিয়া হাসতে হাসতে বললো।

বোধ হয় তাই,—কাজল উত্তর দিলো। আমি যে সব মেয়েদের জানি ওরা ফিল্মআর্টিস্ট, নয়তো বা ফিল্মআর্টিস্টের নকল। তোমায় সেদিন দেখে খুব ভালো লাগলো। তুমি একেবারে অন্যরকম। তাই আজ হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় একটু বেশীরকম ছেলেমানুষী করে ফেললাম। আমার উপর রাগ কোরো না পাপিয়া। দুর্বলতা সব মানুষের মধ্যেই কোনো না কোনো সময় আসে। আজ এই দু-চার মিনিটের জন্যেই তোমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। দুদিন পরে তুমিও আমার কথা মনে রাখবে না, আমিও তোমার কথা মনে রাখবো না। সুতরাং আমার উপর রাগ করে তোমার কোনো লাভ নেই।

কিছু না,—বললো পাপিয়া,—আপনি যে আমার সঙ্গে বেশী ভদ্রতা করবার চেষ্টা করেন, তার জন্যেই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

কাজল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললো,—এবার যাওয়া যাক। তোমায় কোথায় নামিয়ে দেবো, বলো।

পাপিয়া খুব সহজভাবে বলে উঠলো,—আমায় না পরটা-কাবাব খাওয়াবেন বলে তুলে এনেছিলেন ?

কাজল অবাক হয়ে পাপিয়ার দিকে তাকালো।

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, পাপিয়া বাচ্চা মেয়ের মতো বললো।

এক বিখ্যাত নিরালা নিরিবিলি রেস্তোঁরায় খাওয়া দাওয়া করে সহজ গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টায় বেশ কিছুক্ষণ কাটানোর পর কাজল পাপিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু পাপিয়া কিছুতেই রাজী হোলো না।

আচ্ছা, এবার যাই,—রেস্তোঁরার বাইরে এসে পাপিয়া বললো, —অশেষ ধন্যবাদ পরটা-কাবারের জন্যে।

—পাপিয়া, কাজল আস্তে আস্তে ডাকলো।

—কি ?

—আবার কবে দেখা হচ্ছে ?

—হচ্ছে না।

—কেন ?

পাপিয়া একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো,—দেখুন, বাবা অনেক চেষ্টাচরিত্র করে আমার জন্যে এক জার্মানীফেরত ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ঠিক করেছেন। আপনি কি চান আমার সেই সম্বন্ধ ভেঙে যাক ?

কাজল কোনো কথা বললো না কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললো,—বেশ আমি আর তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবো না। তোমার বিয়ের সময় আমায় নেমন্তন্ন করতে ভুলো না কিন্তু—।

আমার ভারী বয়ে গেছে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে,—বলে পাপিয়া চলে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে কাজল অনেকক্ষণ বসবার ঘরে সোফার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো।

টেলিফোন বাজলো।

কাজল টেলিফোন তুলে বললো,—কাকে চান ? কাজলকুমার ? না, উনি বাড়ি নেই।

আবার টেলিফোন এলো।

কাজল উঠে গিয়ে টেলিফোনের প্লাগটা খুলে দিলো।

বাইরের দরজায় বেল বাজলো কিছুক্ষণ পরে।

চাকর এসে বললো,—চামেলী দেবী এসেছেন।

ভাগিয়ে দে।

মিনিট কুড়ি পর বাইরের পোর্টিকোতে গাড়ি এসে থামার আওয়াজ হোলো।

—জুপিটার ফিল্ম-ডিস্ট্রিবিউটার্সের মিস্টার সেন এসেছেন।

—বলে দে, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কাজল সোফা থেকে উঠে পড়ে দোতলায় চলে এলো। জানলা খুলতেই কানে এলো পাশের বাড়িতে পাপিয়া রেওয়াজ করছে।

এবার কাজল ক্ষেপে গেল। চাকরকে ডেকে বললো,—হারুবাবু এলে বলে দিস অন্য পাড়ায় বাড়ি খোঁজ করতে। এ এমন পাড়া যে, সারাদিন খেটেখুটে এসে দু-দণ্ড একটু শান্তিতে বিশ্রাম করবো তার জো নেই।

আলমারি খুলে কালো ড্রেস-ট্রাউজার আর সাদা শার্কস্কিনের কোট বার করলো। তাড়াতাড়ি চান করে এসে আয়নায় খুব ভালো করে দেখে দেখে কড়া শার্টের গলায় একটি বোও আঁটলো।

তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কোনো এক পরিচিতাকে তুলে নিয়ে উপস্থিত হোলো একটি বিখ্যাত ক্লাবে। হুইস্কি পান করলো, নাচলো, হৈ-হৈ করলো। তবু যেন কিছুই ভালো লাগলো না।

তার সঙ্গিনী জিজ্ঞেস করলো,—তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?

কাজল বানিয়ে বললো,—বড্ড মাথা ধরেছে।—বলে খেয়াল হোলো, না, মিছে কথা তো সে বলেনি। মাথাটা সত্যি সত্যিই ধরেছে।

তখন সোজা বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লো।

॥ আট ॥

দিন দুই কলেজ ছুটি ছিলো। পরের দিন কলেজ যেতেই দীপ্তি চেপে ধরলো।

কী ব্যাপার বলতো ?

পাপিয়া হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু দীপ্তি শুনলো না।

—লুকোবার চেষ্টা করছিস কেন ? বল না। কাউকে বলবো না।

পাপিয়া অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলো না যে তাদের শুধু দুদিনের সাময়িক আলাপ।

তখন খুব গম্ভীর হয়ে বললো,—আচ্ছা দীপ্তি, তুই সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করিস যে এর চেয়ে বেশী কিছু কাজলকুমারের পক্ষে সম্ভব ?

দীপ্তি চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো পাপিয়ার দিকে। তারপর বিষণ্ণ হয়ে গেল।

একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো,—ঠিকই বলেছিস। কাজলের পক্ষে সম্ভব নয়! তাই তোর জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

আমার জন্যে ?—পাপিয়া অবাক হোলো।

—হ্যাঁ, তোর জন্যে। আমি তো কিছুই জানতাম না, তাই তোর চোখ মুখ দেখে ভাবছিলাম তোর কি হয়েছে ?

দীপ্তির কথা শুনে পাপিয়া খুব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—আমার চোখ মুখ দেখে ? কেন, কি হয়েছে আমার চোখে মুখে ?

—আয়নায় তোর নিজের মুখ দেখতে পাস না ? তোর মনের ভাব কি তোকে আমায় বুঝিয়ে বলতে হবে ? মনের চেহারা না বদলালে চোখ-মুখ ওরকম হয় না।

পাপিয়া একটু চমকে গেল। তারপর হেসে উঠলো ভীষণ জোরে। বললো,—সুবিমল তোর জীবনে আসবার পর থেকে দেখছি তুই সারা দুনিয়াকেই গোলাপী দেখছিস ?

দীপ্তি হাসলো না।

জিজ্ঞেস করলো—কাজলকুমারের কোনো খবর এর মধ্যে পেয়েছিস ?

—না তো। আর খবর নিয়ে কিই বা লাভ ?

দীপ্তি কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলো পাপিয়ার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো,—ওর খুব জ্বর হয়েছে। সুবিমল বলছিলো।

জ্বর ? ও। তা এ-সময় সবারই এক আধটু জ্বর হয়,—নিস্পৃহ ভাব দেখাবার চেষ্টা করলো পাপিয়া,—মরসুম বদলাচ্ছে তো। সেরে উঠবে দুদিনের মধ্যেই।

সামান্য একটু জ্বর। এমন কিছু নয়। বিকেল বেলা থার্মোমিটার দিয়ে কাজল দেখলো, তখনো নিরেন্নব্বুই আছে। সে ভাবছিলো, এই জ্বর নিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরোনো যায়।

কিন্তু এ মতলব জানতে পেরে সুবিমল চেঁচামেচি করলো।

কাজল বললো,—একটু ব্র্যাণ্ডি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

সুবিমল আপত্তি জানালো।

কাজল বললো,—বেশ বেরোবো না। আয়, তুই আর আমি বসে দাবা খেলি।

সুবিমল রাজী হোলো না। তাকে বেরোতেই হবে। ভীষণ জরুরী কাজ।

—মেয়েটির নাম কি রে ? দীপ্তি ?

সুবিমলের মুখ লাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে দেখলো, পাপিয়া আসছে। ওকে বললো,—খবর দেওয়ার দরকার নেই। সোজা উপরে চলে যান। কাজলদা দাবা খেলার লোক খুঁজছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডাইনে।

ঘরে ঢুকে পাপিয়া দেখলো টেবিলের উপর পা তুলে কাজল একটি হিন্দি গান গাইছে ঃ

পাপিহা—আ—আ বোলে—

পাপিয়াকে দেখে তাড়াতাড়ি পা নামালো। খুব খুশী হয়ে বললো,—এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—আমার কথা? কেন?

—শরীর ভালো নেই। বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না। অথচ একলা বসে ভালো লাগছে না। ভাবছিলাম তুমি যখন আমার পাশের বাড়িতেই থাকো, তখন তোমায় ডেকে একটু গল্পসল্প করলে কেমন হয়।

—আমি কিছুতেই আসতাম না।

—কেন?

—আপনার শরীর ভালো নেই বলে আমায় এসে আপনার সঙ্গে গল্প করতে হবে?

কাজল একটু চুপ করে পাপিয়ার দিকে তাকালো। তারপর বললো,—কিন্তু এলে তো!

—আপনি ডেকে পাঠালে আসতাম না। এসেছি একটু দরকারে। থাক, আপনার শরীর যখন খারাপ তখন আর আপনাকে বিরক্ত করবো না, আমি চললাম।

—না, না। বসো। আমার শরীর কিছু খারাপ হয়নি। একটু জ্বর হয়েছিলো। আজ ঠিক আছে। কি দরকার বলো।

—এসেছিলাম আমার অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে। আপনাদের তো সব সময় সুবিধে মতো পাওয়া যায় না। তাই ভাবলাম, আলাপ যখন হয়েছে, তখন আপনার একটা সই নিয়ে রাখি। তুদিন পরে যখন ভুলে যাবেন, তখন তো আর সুযোগ পাবো না।

—দেখি তোমার অটোগ্রাফের খাতা?

খাতা নিয়ে উল্টেপাল্টে অনেকের নাম দেখলো কাজল। তারপর বললো,—আচ্ছা, সই পরে হবে। এখন চলো, একটু বেরোই।

—না, আমি বেরোতে পারবো না।

—চলো না, কোথাও গিয়ে একটু চা খেয়ে আসি।

—না, না, কোথাও যেতে হবে না। আপনার জ্বর।

— একটুও জ্বর নেই।

—আছে!

—বলছি নেই—,

আমি আপনার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারছি আছে, আর আপনি বলছেন নেই?—কাজলের কপালে হাত রাখলো পাপিয়া,—ওমা, বেশ জ্বর আছে!

দেখলো, কাজল চোখ বুজে আছে পরম পরিতৃপ্তিতে। পাপিয়া হাত সরিয়ে নিলো।

কাজল চোখ না খুলেই বললো,—একটুও জ্বর নেই। আরেকবার হাত দিয়ে ভালো করে দেখ।

—না, আর হাত দিয়ে দেখতে পারবো না। যা দেখবার একবারেই দেখে নিয়েছি।

তোমার হাতে হলুদ-বাটা গন্ধ,—বললো কাজল।

—আপনাকে শুঁকতে বলছে কে?

কাজল চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললো,—ছেলেবেলায় শরীর খারাপ হলে এমনি করে আমার মা কপালে হাত রাখতেন। আর ঠিক ওরকম হলুদ-বাটা গন্ধ পেতাম! খুব ভালো লাগতো।

পাপিয়া একটু হাসলো।

—হাসছো কেন?

—জ্বরের ঘোরে আপনি প্রলাপ বকছেন।

—ম্। কিছু জ্বর নেই আমার। আর থাকলেই বা। আমি জ্বর নিয়েই বেরোবো।

—না, বেরোতে হবে না।

কাজল এবার চোখ খুললো। খুলে বললো,—দেখ, অনেকক্ষণ

থেকে চা খেতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু চাকরটা যে কোথায় গেছে, এখনো দেখা নেই। বাইরে যেতে না পারলে, কখন চাকরটা ফিরবে, সেই আশায় বসে থাকতে হবে।

—তাই থাকুন। এই জ্বর নিয়ে বাইরে গিয়ে চা খেতে হবে না। রেস্তোঁরায় আপনাকে দেখলে লোকজন ছুটে আসবে, বিরক্ত করবে, আর আপনার জ্বর আরো বেড়ে যাবে।

—পার্কস্ট্রীটে গিয়ে চা খাবো। আমি তো অন্য কোথাও যাই না। পার্কস্ট্রীটের রেস্তোঁরায় যারা যায় ওরা আমায় দেখলে বড়ো জোর চোখ তুলে তাকায়, ছুটে আসে না।

—বেশ, যেখানে খুশী যান। আমি বাড়ি চললাম।

—একটু বসে যাও।

—না।

—অটোগ্রাফের খাতাটা ফেলে যাচ্ছো কেন? এটা নিয়ে যাও।

—আপনি সই করে রেখে দেবেন। আমি পরে কাউকে পাঠিয়ে দেবো।

কাজলের কোনো অনুরোধ পাপিয়া শুনলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কাজল চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে অটোগ্রাফ খাতাটা খুললো। পেন তুলে নিলো পাশের টেবিল থেকে। অনেকক্ষণ ভাবলো, খসখস করে কি যেন লিখলো অটো-গ্রাফের পাতায়, তারপর নিচে নাম সই করে দিলো।

তারপর চুপচাপ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

খানিকক্ষণ পর আবার শুনতে পেলো পাপিয়ার গলা। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, পাপিয়া ঘরে ঢুকছে ট্রে-র উপর চায়ের পট, দুধ চিনি আর চায়ের পেয়ালা পিরিচ সাজিয়ে।

কাজল টেবিলের পাশে এসে বসলো। চা তৈরী করে তার দিকে এগিয়ে দিলো পাপিয়া।

তারপর বললো,—চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো আপনি চা খাননি এখনো, মেজাজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে আছে। হয়তো রাগ করে আমার অটোগ্রাফ খাতায় সই আর করবেন না। তাই নিচে গিয়ে আমিই চায়ের জল ফুটিয়ে আনলাম। হ্যাঁ, আমায় মিছে কথা বলেছেন কেন? আপনার চাকর তো কোথাও যায় নি, নিচেই আছে।

চা-টা ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে না কেন?—কাজল প্রশান্ত বদনে জিজ্ঞেস করলো।

—ও বেচারা আরেকজন কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। তাই আর ডাকলাম না। গল্প করছে করুক। তা-ছাড়া আমারও এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করলো।

চা খেতে খেতে কাজল জিজ্ঞেস করলো,—প্রত্যেক দিন ওরকম গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে রেওয়াজ করো কেন? এ দু-দিন আমার এমন মাথা ধরেছিলো!

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি?—চটে গেল পাপিয়া,—জানেন আমি আজ দশ বছর ধরে খেয়াল-ঠুংরি শিখছি?

—দশ বছর ধরে? কোনো কনফারেন্সে গেয়েছো?

—না।

—রেডিওতে প্রোগ্রাম পেয়েছো?

—না।

—তা হলে তুমি গান গাইতে জানো না।

কাজল পাপিয়াকে একটু ক্ষ্যাপানোর জন্যেই বলেছিলো হয়তো, কিন্তু পাপিয়া চুপ করে রইলো খুব সহজ ভালোমানুষ মুখ করে। একটু পরে বললো,—বাবা আমায় গান শিখতে দিয়েছেন শুধু বিয়ের বাজারে আমার দর বাড়ানোর জন্যে।

—কিন্তু তোমার ওই গান শুনলে যে বিয়ের বাজারে তোমার দর একটুও থাকবে না। বাঃবা, যা মাথা ধরে তোমার গান শুনলে!

—আপনি আমার গান শুনেছেন?

—প্রায়ই তো শুনতে পাই এঘর থেকে। কাল সুবিমলকে বলছিলাম অন্য পাড়ায় ঘর দেখতে। ভাড়াটে তাড়াতে হলে বাড়িওয়ালাদের আর মামলা করার দরকার নেই, তোমার গান শুনিয়ে দিলেই চলবে।

পাপিয়া হাসলো, বললো,—আপনি যাই বলুন, আমায় রাগাতে পারবেন না। আপনাদের চালাকি আমি বুঝি।

—কি চালাকি?

—জানি না, যান। আমি এবার যাই। খাতাটা দিন। সই করেছেন?

কাজল খাতাটা এগিয়ে দিলো।

খাতা খুলে দেখলো পাপিয়া। জিজ্ঞেস করলো,—একি?

কাজল হাসলো। বললো,—সই তো সবাইকে দিই। তোমায় দু-লাইন কবিতা লিখে দিলাম।

পাপিয়া পড়লো,—

পাপিয়া, তোমার রঙিন খাতায় আমি সামান্য সই,
তার বেশী কিছু নই।
তবুও তোমার মনের পাতায় যে-রং আছে,
সে হোক অনেক মধুর স্মরণ আমার কাছে।

পাপিয়া হাসতে লাগলো। ভীষণ হাসতে লাগলো।

হাসছো কেন?—কাজল জিজ্ঞেস করলো।

—ফিল্ম-স্টারের লেখা কবিতা! হাসি পাবে না? কোনো কবি যদি ফিল্ম-স্টার হতে চায় আপনার হাসি পাবে না?

কাজল চুপ করে রইলো।

রাগ করলেন আমার কথায়?—জিজ্ঞেস করলো পাপিয়া।

—সত্যি কথাই বলেছো। রাগ করবো কেন?

—না, সত্যি রাগ করবেন না। আমি এমনি বলছিলাম। আপনি তো শুধু সই করেন। আমার খুব সৌভাগ্য, আপনি আমার খাতায় শুধু সই করলেন না, কবিতাও লিখে দিলেন।

কাজল একটু হাসলো। বললো,—তুমিই একমাত্র মেয়ে, যার খাতায় আমি কবিতা লিখে দিয়েছি।

পাপিয়ার কান দুটো হঠাৎ লাল হয়ে গেল।

পাপিয়ার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো কাজল, ঠিক যেমনি করে সিনেমার রুপালী পর্দায় নায়িকার হাত সে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, এবং আলোড়ন জাগায় প্রেক্ষাগৃহের দর্শক আর দর্শক-বধূদের মনে।

আস্তে আস্তে পাপিয়ার নাম ধরে ডাকলো।

কিন্তু পাপিয়া ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। হাতটা সরিয়ে নিলো না, ধরে রাখতে দিলো কাজলকে, কিন্তু আস্তে আস্তে সহজভাবে বললো,—এ খেলা আপনি অনেকের সঙ্গে-ই খেলেছেন, আমার সঙ্গে আর কেন ?

কাজল পাপিয়ার হাত ছেড়ে দিলো।

পাপিয়া বলে গেল,—আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছে, দু-দিন পরে আমার বিয়ে হয়ে যাবে। এমনি বসে আমার সঙ্গে গল্প করুন। পরে যখন আমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না তখন আমার নাম ভুলে যাবেন, কিন্তু চিরকাল যখনই আপনার অভিনয়ের আর প্রতিভার অনুরাগিনী মেয়েদের কথা ভাববেন, তখনই আমার চেহারা মনে পড়ে যাবে, মনে পড়বে যে ওরা সিনেমার নায়িকাদের মতো সুন্দর নয়, উপন্যাসের নায়িকার মতো ভাববিলাসী নয়। ওদের চেহারা আমারই মতো সাধারণ, ওদের মেলামেশা কথাবার্তা আমারই মতো সহজ। ওদের আপনি যতো সহজভাবে ভালোবাসবেন, আপনার প্রতিভার প্রকাশ ততোই সুন্দর ও সার্থক হবে, আর আপনি চিরকাল শিল্পী হিসেবে তাদের মনের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। ছলনা করবেন আপনার আশে পাশের ছলনাময়ীদের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে নয়।

কাজল নিস্পলক তাকিয়ে পাপিয়ার কথা শুনছিলো।

পাপিয়া হেসে জিজ্ঞেস করলো,—কি দেখছেন?

—তোমায় দেখছি। তুমি একটি উনিশ কুড়ি বছরের বাচ্চা মেয়ে, দেখে তাও মনে হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝে তুমি কথা বলো প্রবীণ লোকের মতো।

আমার বয়েসী মেয়েরা ছেলেমানুষ নয়,—পাপিয়া উত্তর দিলো, —ওদের ছেলেমানুষীটা একটা মুখোস, আরো কম বয়েসের অভ্যেসটা এ বয়েসে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা যায় না বলে। আসলে আমার বয়েসী মেয়েদের মনের বয়েস সাতাশ আটাশ বছরের মেয়েদের মতো। তবে আমরা ছাড়া একথা আর কেউ বুঝতে চায় না,—একটা ছেলেমানুষী সহজ সুরে সে কথা শেষ করলো।

কাজল হেসে ফেললো পাপিয়ার কথা শুনে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর খুব সহজ গলায় বললো,—জানো পাপিয়া, আমি পরশু বম্বে চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি,—আরো সহজ গলায় পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ। এখানে নিজে প্রডাকশান করবো বলেই এসেছিলাম। কয়েকদিন শুটিংও করেছি। আর তিন চারদিন শুটিং করে তারপর চলে যাবো। বম্বেতে একটা নতুন বইতে নামছি।

—এখানকার কাজ আবার কবে সুরু করবেন?

—আরেকজন নিয়ে নিচ্ছে এখানকার প্রডাকশান দেখাশোনা করবার ভার। আমি শুধু মাঝে মাঝে শুটিং এর জন্যে আসবো।

—আবার কবে আসবেন?

—জানি না। দু-মাস পরেও হতে পারে, ছ-মাস পরেও হতে পারে।

—বাড়িটা ছেড়ে দেবেন?

—ছেড়ে দেবো কেন? ও, তুমি জানো না। বাড়িটা প্রথমে ভাড়া নিয়েছিলাম কিন্তু এখন ঠিক করেছি এটা কিনে নেবো। কলকাতায় একটা স্থায়ী আস্তানা দরকার। এখানে সুবিমল

থাকবে। প্রডাকশানে আমার একটা শেয়ার আছে তো। তাই আমার হয়ে সুবিমল আমার অন্য অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করবে।

পাপিয়া চুপচাপ শুনলো। কোনো কথা বললো না।

কাজল বলে গেল,—কলকাতায় যখনই আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবো।

করবেন কি?—পাপিয়া হাসতে হাসতে বললো,—আপনি তো একজনের পর একজন সবাইকে ভুলে যান।

—একজনের পর একজন হওয়ার মতো যারা, তাদের ভুলে যাই। তাদের দলের তো তুমি নও। তাই কলকাতায় এলেই তোমায় মনে পড়বে।

মনে পড়ে কোনো লাভ নেই,—পাপিয়া বললো।

—কেন?

—তদ্দিনে হয়তো আমার বিয়ে হয়ে যাবে। আমি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো।

ও,—চুপ করে গেল কাজল।

একটু পরে পাপিয়া উঠে পড়লো, বললো,—আমি এবার যাই।

—আচ্ছা।

পাপিয়া!—দরজার কাছে যেতে কাজল ডাকলো পেছন থেকে।

ফিরে দাঁড়িয়ে পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো,—কি?

—শোনো।

পাপিয়া ফিরে এলো।

—আচ্ছা পাপিয়া, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

—কি অনুরোধ?

—শোনো, এরপর হয়তো অনেকদিন আমাদের দেখা হবে না। একেবারেই না হতে পারে। যদি হয়ও বা এখনকার মতো অবসর তোমারও থাকবে না, আমারও থাকবে না। কাল যদি তোমার অন্য কাজ না থাকে তো চলো, সারাদিন আমরা একসঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাবো।

সা-রা-দি-ন ? —পাপিয়ার চক্ষু বিস্ফারিত হোলো।

—হ্যাঁ, ঠিক সন্ধ্যে পর্যন্ত। সন্ধ্যের আগেই তুমি বাড়ি ফিরে আসবে।

—সারাদিন কোথায় কাটাবেন ?

যেখানে তোমার খুশি,—কাজল বললো,—প্রোগ্রাম তুমি করবে। আমি শুধু সঙ্গে থাকবো।

একটু ভেবে পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো,—দীপ্তিকেও নেবো সঙ্গে ?

—না, দীপ্তি টিপ্তি কাউকে নয়। শুধু তুমি আর আমি।

পাপিয়া আবার ভাবলো। তারপর বললো,—আচ্ছা, আমি যেখানে-যেখানে নিয়ে যেতে বলবো, সেখানেই শুধু। আমার কথা না শুনলে কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নেমে যাবো।

—বেশ তাই হবে।

—কিন্তু আমায় যে কলেজ পালাতে হবে!

—তোমায় কোথায় তুলে নেবো, বলো। কলেজের সামনে ?

—না, না, সেখানে নয়। বলছি।—আচ্ছা, আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবো।

ওখানে কেন ?—বললো কাজল,—আর একটু নির্জন কোনো জায়গায়—।

—না, না, নির্জন জায়গা নয়। নির্জন জায়গায় অপেক্ষা করলে সবারই চোখে পড়ে। হাজরার মোড়ে এত ভিড় যে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ লক্ষ্য করবে না, খুব চেনা কেউ দেখে ফেললেও ভাববে ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

—কটায় ?

—ঠিক দশটায়। এক মিনিট দেরি হলে কিন্তু আমি আর দাঁড়াবো না।

॥ নয় ॥

বাড়ি ফিরে আসতে পাপিয়ার মা মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন, —মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হোলো ?

—হ্যাঁ, ওদের ওখানেই তো ছিলাম এতক্ষণ। ওর সঙ্গে বসে ইকনমিক্স্ পড়ছিলাম।

—এত দেরি করলি কেন ? যা অসুবিধায় পড়েছি। নিচে কর্তা হাঁকছেন, চা পাঠিয়ে দাও। কে যেন এসেছেন ওঁর কাছে। অথচ রামু বাড়ি নেই। ওকে মুদির দোকানে পাঠিয়েছি। ওর ফিরতে দেরি হবে। কাকে দিয়ে যে পাঠাই !

—আমায় দাও। আমি দিয়ে আসছি।

পাপিয়া চা নিয়ে নিচে দিয়ে এলো। তিন চারজন ভদ্রলোক নীহারবাবুর সঙ্গে বসে কথা বলছেন। তাদের মধ্যে একজন খুব কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাক পরা। তাকে দেখে পাপিয়ার মনে হোলো আগে কোথায় যেন দেখেছে। সেও একটু বিস্মিত হয়ে তাকালো পাপিয়ার দিকে।

পাপিয়া চা দিয়ে চলে এলো।

অভ্যাগতেরা চলে যাওয়ার পর নীহারবাবু খুব গম্ভীর মুখে পাপিয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকে গম্ভীর ভাবে ডাকলেন,—পাপিয়া!

—কি বাবা ?

—মিস্টার মজুমদার বলছিলেন তোকে নাকি একদিন পাশের বাড়ির ওই ফিল্ম-এ্যাকটার কাজলকুমারের সঙ্গে পার্কষ্ট্রীটে কোথায় বসে চা খেতে দেখেছে ?

পাপিয়া কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই মনোরমা তেড়ে উঠে মেয়ের পক্ষ নিলো। স্বামীকে বললো,—তোমার কি মাথা খারাপ হোলো নাকি ? আমার মেয়ে বসে চা খাবে ফিল্মআর্টিস্টের

সঙ্গে? যে যা বলবে তাই বিশ্বাস করে নেবে? ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দেখেছেন। আর লোকটাই বা কিরকম, যদি আমার মেয়ে কারো সঙ্গে বসে চা খায় তো ওর তাতে কি?

কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়ে এসব কথা উঠলে যে ওর বিয়ের কথাবার্তা সব ভেস্তে যাবে, সে কথা বুঝছো না কেন?—বললেন নীহারবাবু।

—লোকে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বললে, তাদের কথা মেনে নিতে হবে নাকি? তোমার ওই মজুমদার লোকটাকে বলে দাও, এসব বাজে কথা রটাতে সুরু করলে ভালো হবে না কিন্তু।

—ওর কি দায় পড়েছে মিছে কথা বলবার? পাপিয়াকে ওখানে কোথাও না দেখলে ও মিছিমিছি এসব কথা বলতে যাবে কেন?

ও কক্ষনো পাপিয়াকে কারো সঙ্গে দেখেনি,—জোর গলায় বললো মনোরমা!

আলবৎ দেখেছে,—আরো জোর গলায় ঘোষণা করলেন নীহারবাবু।

—আমি বলছি দেখেনি। তুই বল পাপিয়া, তোকে ও কোনোদিন পার্কস্ট্রীটে কোনোদিন কোনো রেস্তোঁরায় দেখেছে?

দেখে থাকতে পারে,—পাপিয়া হাল্কা সুরে উত্তর দিলো,—একদিন আমি, মঞ্জু আর দীপ্তি চা খেতে গিয়েছিলাম।

তাই বল,—বলে উঠলেন মনোরমা,—দীপ্তি-মঞ্জুদের সঙ্গে গিয়েছিলি। মজুমদার লোকটা কি? সে কিনা বলে বসলো তোকে কাজল মিত্রের সঙ্গে চা খেতে দেখেছে!

কাজলকুমারও সেই রেস্তোঁরায় ছিলো যে!—বললো পাপিয়া।

—তা থাকলোই বা। মজুমদার তো তোকে তার টেবিলে দেখেনি।

—তাও দেখে থাকতে পারে।

এঁ্যা!—স্তম্ভিত হলেন মনোরমা,—কি বলছিস তুই?

আমি বলিনি?—ঘোষণা করলেন নীহারবাবু,—তুই কেন সে

লোকটার টেবিলে গিয়ে বসলি? কি করে আলাপ হোলো ওর সঙ্গে? আমি তোকে ওই জানলাটা বন্ধ করে রাখতে বলিনি? মন্মথবাবু যদি জানতে পারেন আমি ওঁকে কি বলবো? লোক জানাজানি হলে সবার কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে?

শঙ্কিত শিশুর মতো মুখ করে বসে রইলো পাপিয়া। মেয়ের মুখ দেখে মনোরমা বুঝে নিলেন যে, মেয়ের কোনো দোষ নেই। নীহারবাবুর বলায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও, অতো উত্তেজিত হোয়ো না, ব্যাপারটা আগে শুনি। পাপিয়া, তুই কি সত্যি সত্যি ওর সঙ্গে বসেছিলি এক টেবিলে?

এক মিনিটের জন্য শুধু,—দশ বছরের বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদো-কাঁদো গলায় পাপিয়া বললো।

—কেন?

—ওর অটোগ্রাফ নিতে গিয়েছিলাম।

ও, তাই,—নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মনোরমা, —এই ব্যাপার।

কেন অটোগ্রাফ নিতে গিয়েছিলি? কি দরকার অটোগ্রাফ নেওয়ার?—অভিভাবকত্ব জাহির করতে চাইলেন নীহারবাবু।

এতে রাগ করবার কি আছে,—স্বামীকে ধমকে মনোরমা বললেন,—অটোগ্রাফ নিতে দোষ কি? ভালো অভিনয় করে, দেশজোড়া নাম, অটোগ্রাফ যারা নেয় ওরা ওর কাছে যাবে, এতে দোষের কি আছে? ওর অটোগ্রাফ খাতাতো তুমিই কিনে দিয়েছিলে। যাও, যাও, এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে অতো মাথা গরম কোরো না।

আর কোনোদিন পার্কস্ট্রীটে কোথাও চা খেতে যাবি না,—আদেশজারি করলেন নীহারবাবু।

—আচ্ছা।

দরজার কাছে গিয়ে নীহারবাবু আবার ফিরে দাঁড়ালেন।

—ওই জানলাটা বন্ধ করে রাখবি।

—আচ্ছা।

—সব সময়।

—আচ্ছা।

—আমায় না জিজ্ঞেস করে কখনো কোনো ফিল্মস্টারের অটোগ্রাফ নিতে যাবি না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা।

হাজরার মোড়ে ট্রামস্টপের কাছেই একটি মস্তো বড়ো হোর্ডিং। সেখানে কাজলকুমারের মস্ত বড় একটি ছবি আঁকা।

ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো কয়েকজন কলেজের ছেলে-মেয়ে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কাজলকুমার, তার আসন্ন ছবি, এবং সে ছবির নায়িকা দীপাকুমারী।

কাজেই পাপিয়া দাঁড়িয়েছিলো। তার কানে প্রত্যেকটা কথাই ভেসে আসছিলো।

সে ঘড়ি দেখলো। তখন প্রায় দশটা বাজে।

আরো তিন চার মিনিট কেটে গেল। ছাত্র-ছাত্রী ক'জন তখনো মহাউল্লাসে কাজলকুমার দীপাকুমারীকে নিয়ে আলোচনা করছে।

আর ঠিক তু-মিনিট দেখবো—পাপিয়া ভাবলো—সে যদি না আসে তো বাঁচা যায়।

কাজলকুমার দীপাকুমারীর নাম বারবার ভেসে এলো তার কানে।

শেষ তু-মিনিটও যখন কেটে যায় যায়, তখন একটা উচ্ছ্বসিত কলতান শুনলো,—কাজলকুমার! কাজলকুমার!!

পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে দেখলো কাজলের গাড়ি ফুটপাথের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—এত দেরি কেন?

কি করবো? একপাল গরু পড়েছিলো গাড়ির সামনে,—কাজল উত্তর দিলো।

পাপিয়া তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লো। গাড়ি মিশে গেল ট্র্যাফিকের ভিড়ে।

ট্রামস্টপের কাছে যারা যারা দাঁড়িয়েছিলো, তাদের মধ্যে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলো,—ওই যে গাড়িতে উঠে পড়লো একজন, যে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো এখানে, কে সে?

কেউ বলতে পারলো না।

এবার ওরা আপসোস করতে লাগলো, কেন মেয়েটিকে ভালো করে লক্ষ্য করা হয়নি।

—কোথায় যাবে, বলো?

খেয়ে নেওয়া যাক কোথাও গিয়ে,—পাপিয়া বললো,—এখন কোনো একটা বড়ো হোটেলে চলুন, যেখানে আমি কোনোদিন যাইনি, আর পরে যাবো বলেও আশা করি না।

—তুমি বলো কোথায় যাবে।

একটি খুব অভিজাত চীনে রেস্তোঁরার নাম করলো পাপিয়া।

কাজল তাকে সেখানে নিয়ে গেল।

নানারকক চীনে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হোলো তাদের সামনে। কাজল একজোড়া হাতির দাঁতের চপ-স্টিক আনিয়ে পাপিয়াকে চীনেদের মতো কাঠি দিয়ে খাওয়া শেখাবার চেষ্টা করলো। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিলো পাপিয়া।

চুপচাপ খেয়ে গেল দুজনে।

তারপর পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো,—চুপ করে আছেন কেন? কি ভাবছেন?

—কিছু ভাবছি না। শুধু তোমায় দেখছি।

—কি দেখছেন?

—দেখছি তুমি কতো কাছে, তবু কতো দূরে। ভাবছি ফিল্ম-স্টার না হয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ার কি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট্ কি ডাক্তার হতাম, কতো বেশী সুখী হতাম আমি।

পাপিয়া হেসে ফেললো। বললো—আর আমি আপনাকে দেখে ভাবছি আমি একটি সাধারণ মেয়ে না হয়ে যদি ফিল্ম-স্টার হতাম, আমি কতো সুখী হতাম। ওদের কতো টাকা!

কাজল হেসে উত্তর দিলো,—একটুও সুখী হতে না। ফিল্ম-স্টারদের জীবনে কতো কষ্ট তুমি জানো না।

—কষ্ট! কেন?

—প্রত্যেক মুহূর্তে ভয়, যদি তাদের বক্স-অফিস নষ্ট হয়ে যায়। রাত্তিরে ঘুম নেই, দিনে সোয়াস্তি নেই, ওঠা-বসা চলাফেরা সব কিছু ওই বক্স-অফিসের উপর চোখ রেখে।

একটু দুর্ভাবনা তো ছোটো-বড়ো সব পেশাদারী লোকেরই থাকে,—পাপিয়া উত্তর দিলো।—আমার বাবা একজন সাধারণ এ্যাডভোকেট। ওঁর দুর্ভাবনা কম?

ফিল্ম-আর্টিস্টদের মতো নয়। পাবলিসিটির সুবিধে-অসুবিধে হিসেব করে সব সময় গ্ল্যামার, গ্ল্যামার আর গ্ল্যামার—এই গ্ল্যামার বজায় রাখতে গিয়ে জীবন কতো কৃত্রিম হয়ে ওঠে তুমি ভাবতে পারবে না।

একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্যে একটু দামও যদি দিতে না চান তো চলবে কেন?—পাপিয়া বললো।

—ভবিষ্যৎ? ফিল্ম-স্টারের ভবিষ্যৎ? আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। বর্তমানকে কদ্দিন টিকিয়ে রাখা যায় তাই নিয়ে আমাদের জীবনসংগ্রাম।

—কেন? চিরকালই যে নায়ক সাজতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। বয়েস হয়ে গেলে অন্য ভূমিকায় নামবেন।

কাজল হাসলো। বললো,—সে একজন দুজন পারে। সবাই পারে না। ফিল্ম-স্টারের বুড়ো বয়সের মতো দুঃখের জীবন আর নেই।

—দুঃখের জীবন? কেন?

—তোমরা যখন ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নাতি নাতনির মুখ

দেখবে, ওদের মুখে তখনকার দিনের নতুন নায়কনায়িকাদের গল্প শুনবে, আমরা তখন একলা ঘরে বসে গুমোট সন্ধ্যেবেলা পুরোনো এ্যালবামের পাতা খুলে সিনেমার বইয়ের পুরোনো কাটিংগুলো দেখবো।

এতই যদি ভাবনা তবে ফিল্মে এলেন কেন?—পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

—আমি কি ইচ্ছে করে এসেছি? আমার ভাগ্য আমায় এপথে টেনে এনেছে।

—ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার হলেই পারতেন।

—সে ইচ্ছে তো ছিলো। কিন্তু কি করবো! কলেজের পড়া শেষ করবার আগে পড়া ছাড়তে হোলো।

—সে তো আপনি ইচ্ছে করে ছাড়লেন। আপনার এত থিয়েটারের নেশা যে বাবাকে না জানিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে যোগ দিলেন।

—কে বললে?

—একটি সিনেমা ম্যাগাজিনে আপনার জীবনকাহিনী পড়েছিলাম।

ওসব বাজে কথা,—কাজল ম্লান হেসে বললো,—সিনেমা-ম্যাগাজিনে ওরকম জীবনকাহিনী না বেরোলে আমাদের বক্স-অফিস থাকে না।

—তাহলে পড়া ছাড়লেন কেন?

—বাবার চাকরি চলে গেল। আমার পড়ার খরচা চালানোর মতো অবস্থা ছিলো না। আমি তো নিজের থেকে পড়া ছাড়িনি। বাবাই ছাড়িয়ে দিলেন।

ও।—একটু ম্লান হোলো পাপিয়া,—তাহলে আপনি বি-এস্-সি পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে দিলেন?

বি-এস্-সি?—অবাক হোলো কাজল।

—ওরা তো তাই লিখেছিলো!

—আমি শুধু ফার্স্ট-ইয়ারে আট-ন মাস পড়েছি।

—ও—। তারপর থিয়েটারে যোগ দিলেন

-হ্যাঁ। তবে অভিনয় করবার জন্যে নয়। বুকিংএ টিকিট বিক্রি করবার চাকরি নিয়েছিলাম।

—আপনার জীবনকাহিনীতে তো সে কথা পড়িনি।

—আমার জীবনকাহিনী তো আমি লিখিনি। এক সিনেমা কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার লিখেছে।

—তারপর ?

—তারপর আর কি,—কিছুদিন এখানে চাকরি, ওখানে চাকরি। পঞ্চাশ টাকা মাইনে, পঁচাত্তর টাকা মাইনে, একশো টাকা মাইনে। আমার শেষ চাকরি এক মার্চেন্ট অফিসে,—একশো পঁচিশ টাকা মাইনে। ভালো সাঁতার কাটতে পারতাম, ফুটবল খেলতে পারতাম, তাই মার্চেন্ট অফিসে চাকরি যোগাড় করে নিতে অসুবিধে হোলো না।

—সেই চাকরি ছাড়লেন কেন ?

—কে বললে ছেড়েছি ?

—আপনার জীবনকাহিনীতে তো তাই পড়েছি। বম্বেতে গিয়ে সিনেমায় যোগ দেওয়ার জন্যে আপনি চাকরি থেকে রিজাইন করলেন।

—না, একদম বাজে কথা। অফিসে ছাঁটাই হোলো, তাইতে আমার চাকরি গেল। তারপর কলকাতায় অনেকদিন ফিল্মে একস্ট্রা হয়ে, সুপার হয়ে নেমেছি অনেক বইতে। একটা বইতে ভালো রোল পেয়েছিলাম। কিন্তু এমন বরাত, সে-বই খানিকটা উঠে বন্ধ হয়ে গেল।

—তখন বম্বে চলে গেলেন ?

—হ্যাঁ। আমার এক বন্ধুর দাদা ওখানে ফিল্ম-ডিরেকটার ছিলো। বন্ধুর চিঠি নিয়ে হাতের ঘড়ি বেচে বম্বে চলে গেলাম।

—গিয়েই হীরোর রোল পেলেন ?

—না। মাসে দুটো কি তিনটে ক্রাউড-সীন, ব্যস। তিনটে বছর যে কী কষ্টে কেটেছে, সে আমি জানি আর ভগবান জানেন।

—তারপর একদিন অনন্ত ত্রিবেদীর চোখে পড়লেন। তিনি প্রতিভা আবিষ্কার করলেন আপনার মধ্যে।

—একটুও না। ওটা ওই জীবনকাহিনীর বানানো গল্প। আসল ব্যাপারটা খুব কম লোকেই জানে। মুক্তাবাঈ নামে একজন অভিনেত্রী ছিলো। ওঁর বয়েস হয়ে যাচ্ছিলো বলে আর নায়িকার ভূমিকা পেতো না। কিন্তু তার যে বয়েস হয়ে যাচ্ছে সেকথা সে মানতে রাজী নয়। তার প্রিয়পাত্র এক বেকার এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার ছিলো। তার নাম জয়প্রকাশ। সেই জয়প্রকাশ মুক্তাবাঈকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একটি নতুন বই তুলতে রাজী করালো। গল্প তার নিজের, পরিচালনাও সে নিজেই করবে। মুক্তাবাঈ হবে নায়িকা। মুক্তাবাঈ তার সঞ্চয় যা কিছু ছিলো, সবই ঢাললো সে বইতে। সে এমন বেশী কিছু টাকা নয়, বড় জোর দিন দশ বারো শুটিং করবার মতো টাকা।

—আপনাকে সেটাতে নায়কের ভূমিকা দিলো ?

—হ্যাঁ। সস্তায় নায়ক পাওয়া যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে জয়প্রকাশের আলাপ ছিলো। সে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। নায়ক হবার মতো যোগ্যতা যে আমার কিছু ছিলো তা নয়। মুক্তাবাঈকে খুশী করবার জন্যে গল্পটা এমন ভাবে লেখা যে বইয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তাবাঈ ছাড়া আর কোনো চরিত্রেরই কোনো বিশেষত্বই নেই। সুতরাং নায়কের শুধু চেহারা ছাড়া আর কিছু দরকার নেই। আমার সেটা আছে। সুতরাং আমি নায়ক হলাম।

পাপিয়া হাসলো। বললো,—ব্যস, বইটা হিট্ হোলো, না ?

—না। শোনো বলছি। বই খানিকটা উঠবার পর জয়প্রকাশ বেচারা একদিন বাস এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল। মুক্তাবাঈয়েরও টাকা ফুরিয়ে গেছে। অনন্ত ত্রিবেদীর দাদা বসন্ত ত্রিবেদী ছিলো একজন মাঝারী গোছের ডিসট্রিবিউটার। মুক্তাবাঈ তাকে গিয়ে ধরে পড়লো। কি করে রাজী করালো জানি না। আরেকটি

বইতে আবার একটি সুপারের রোল করছি একদিন, এমন সময় হঠাৎ ডাক পড়লো। শুনলাম বসন্ত ত্রিবেদী বইটা ফিন্যান্স করছে, আর অনন্ত ত্রিবেদী পরিচালনা করছে। সেটে আমায় কী গালাগালি দিতো ওই অনন্ত ত্রিবেদী! নেহাত কয়েক হাজার ফিট তোলা হয়ে গেছে, আমায় আর বাদ দেওয়া চলে না বলেই আমি সে-বইতে নায়ক থেকে গেলাম।

পাপিয়া হাসতে লাগলো,—তা হলে একেই বলা হয় বিখ্যাত চিত্রপরিচালকের চোখে পড়ে যাওয়া! বইটা তাহলে বাজারে বেরোতেই আপনার খুব নাম হয়ে গেল—না?

বিষণ্ণ হাসি হাসলো কাজল। বললো,—কি ভাবে হোলো, সেটা এক মজার গল্প। এক নামকরা কাগজের এক বিখ্যাত চিত্রসমালোচক ছিলো। সে নাকি একবার মুক্তাবাঈয়ের কাছে খুব অপদস্থ হয়েছিলো তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মাখামাখি করতে গিয়ে। তার হঠাৎ কি খেয়াল হোলো, প্রাণভরে গালাগাল দিলো মুক্তাবাঈয়ের অভিনয়কে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বড়কে ছোটো করতে হলে ছোটোকে বড়ো করতে হয়। তাই দেখলাম। সেই সমালোচক আমার অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলো, বললে শুধু আমার অভিনয়ের জন্যেই নাকি বইটি শেষ পর্যন্ত বসে দেখা যায়।

সত্যি সত্যি খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন?—পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

—অভিনয় কি করে করবো? কিচ্ছু করিনি। বিশ্বাস করো আমায়, সারা বইতে ব্যাঙের মতো ড্যাবড্যাব করে নায়িকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা আর গানের প্লে-ব্যাকের সঙ্গে ঠোঁট মেলানো ছাড়া আমার বিশেষ কিছু করবার ছিলো না।

—তবু খুব প্রশংসা হোলো?

—হোলো তো। অতো বড়ো একজন সমালোচক বলছেন, লোকে খারাপ বলতে সাহস পেলো না। দেখলাম সাতদিনের মধ্যে চারটে বইয়ের কনট্রাক্ট এসে গেল।

—বইটা তাহলে হিট হয়েছিলো?

—না, একেবারে ফ্লপ্। মুক্তাবাঈয়ের ছবির পয়সা উঠলো না। তার নাম আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল। জয়প্রকাশ বলে যে কেউ কোনোদিন ছিলো সে কথাও কেউ মনে রাখলো না। অনন্ত ত্রিদেবী আরো তিনটে ফ্লপ্ বই করে ফিল্ম লাইন থেকে বিদায় নিলো—কিন্তু আমার পথ খুলে গেল। তারপর কি করে যেন আমার সঙ্গে জোড় মিলে গেল দীপাকুমারীর সঙ্গে। লোকে কোনো বইতে আমাকে আর ওকে একসঙ্গে পেলে আর কিছু চায় না.—গল্প চায় না, ভালো অভিনয় চায় না, টেকনিক্যাল সাফল্য চায় না, —শুধু আমি আর দীপাকুমারী যে দুজনে নিরালায় বসে গান গাইছি, হাত ধরে দুজনে দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি এবং কাহিনীর শেষে দুজনে দুজনার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি,—এটুকু পেলেই খুশি।

এরকম হয় কেন? —পাপিয়া একটা সহজ ছেলেমানুষী কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলো।

শোনবার লোক পেয়ে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো কাজল মিত্র। বলে গেল খুব গুরুগম্ভীর চালে,—কারণ খুব সহজ। নিজের কল্পনার জগতে প্রত্যেক ছেলে মেয়েই নায়ক বা নায়িকা। তার একটা নিজের আপন নায়িকা বা নায়ক থাকে। তার কল্পনার পরিবেশ সে যদি চিত্রকাহিনীর মধ্যে খুঁজে পায়, তখন প্রত্যেক ছেলের সঙ্গেই আমার এবং প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গেই দীপাকুমারীর একটা আইডেন্টিফিকেশন বা মানসিক সমন্বয় হয়। তখন সে দেখতে আসে কাজলকুমারকে বা দীপাকুমারীকে নয়,—সে দেখতে আসে নিজেকে, তার কল্পনার নায়ক নায়িকাকে, অভিনয় খারাপ হলেও সে বুঝতে পারে না, কারণ সে যেটা দেখে সেটা তার নিজের মনের অভিনয়। আমাকে বা দীপাকুমারীকে সে প্রশংসা করে না, সে করে আত্ম-প্রশংসা। তাই তার প্রশংসার এত উচ্ছ্বাস। পথে ঘাটে সে আমাকে বা দীপাকুমারীকে দেখতে ছুটে আসে না, সে ছুটে আসে

তার নিজের কাল্পনিক ব্যক্তিত্বের একটা রক্তমাংসে গড়া রূপকে দেখতে। তাই তার এত উন্মাদনা।

পাপিয়া মন দিয়ে শুনছিলো। খানিকটা বুঝছিলো, খানিকটা হয়তো বুঝতে পারেনি। বিনুনী দুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কিন্তু এরকম হবেই বা কেন?

—কারণটা আজকের দিনের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা। সাধারণ মানুষের জীবনের পরিধি আজ এত সংকীর্ণ যে তার self expression-এর, নিজেকে প্রকাশ করবার, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই তার ব্যক্তিত্বকে সে আরোপ করে আমার উপর, দীপাকুমারীর উপর। সেজন্যে আমরা সাধারণ দর্শকের সমাদর পাই, কিন্তু যাদের নিজেকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্র বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক, যেমন কবি, শিল্পী, মঞ্চের অভিনেতা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, তাদের আমরা হতাশ করি।

এ রকম অবস্থা কি চিরকালেই থাকবে?—পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

—না, থাকবে না। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রসার যখন আরো বিস্তীর্ণ হবে, আমাদের অভিনয়, আমাদের শিল্পকলা তখন আরো সহজ হবে, আরো স্বাভাবিক হবে, আরো সুন্দর হবে। কারণ, তখন সাধারণ মানুষের সহজ সুন্দর কল্পনার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ও করতে হবে সেভাবেই।

পাপিয়ার মনে হোলো, কাজলকে এখন তার একটু একটু ভালো লাগছে। জিজ্ঞেস করলো,—আপনি এত চিন্তা করেন?

—শিল্পী মাত্রই চিন্তা করে, পাপিয়া।

—তা হলে সবার সামনে আপনি এত হাল্কা কেন?

—ও ভাবেই আমায় সবাই পেতে চায়। আমায় কতো দুঃখে যে অতো হাল্কা হতে হয়, সে তুমি এখন বুঝবে না, বড়ো হলে বুঝবে।

পাপিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বললো,—আমি এখনই বুঝছি। আমি যথেষ্ট বড়ো হয়ে গেছি। খুব গভীর ভাবে আমিও ভাবি।

কি ভাবো পাপিয়া,—কাজল হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো।

—সে আপনাকে বলবো না। আচ্ছা, এটুকু বলবো,—আমি আমার জীবন নিজের হাতে তৈরী করতে চাই। ছেলেরা যেভাবে করে ঠিক তেমনি।

বেশ তো, করো না,—কাজল বললো।

—না, সে আর আমার বেলা হয়ে উঠবে না। বাবা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।

একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো কাজলের মুখে। কিছু বললো না।

পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা, আপনি এতই যদি বোঝেন তো এরকম ছেলেমানুষী বোম্বাই-মার্কা অভিনয় করেন কেন?

—উপায় নেই বলে করি। বাজারদরটা রাখতে হবে বলে করি। সাধারণ দর্শকের প্রতিভূ হিসেবে প্রযোজক ও পরিবেশক চায় বলে করি। কিন্তু, বিশ্বাস করো পাপিয়া, আমার একটুও ভালো লাগে না। আজ পর্যন্ত কোনো পরিচালক আমায় ভালো অভিনয় করবার সুযোগ দেয়নি। যে দেবে, আমি তার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

পাপিয়া চুপচাপ শুনলো।

কাজল আস্তে আস্তে বললো,—আজ তোমায় এত কথা কেন বললাম জানিনা। এসব আমি আর কাউকে কোনোদিন বলিনি।

পাপিয়া আরো আস্তে আস্তে বললো,—আমিও তো আপনাকে আমার কথা বললাম। আমিও তো সে কথা কাউকে বলিনি।

—কি বললে?

কেন? ওই সে বললাম, আমি আমার জীবনটাকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে চাই, ছেলেরা যেমনি গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি।

এ তো এমন বেশী কিছু বলো নি তুমি,—কাজল বললো,—এ তো একটুখানি কথা।

এই আমার অনেকখানি,—পাপিয়া উত্তর দিলো,—এও আমি করতে পারছি না, মুখ বুঁজে মা-বাবার কথা মতো বিয়ে করতে হচ্ছে,—এর বেশী আপনাকে কি বোঝাবো বলুন ?

কাজল একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো একটুখানি হেসে,—কেন এত কথা বললাম কে জানে। অন্য মেয়েরা আমার সঙ্গে ভাব করতে আসে, তাই তাদের অন্য কথা বলি। তুমি আমার সঙ্গে শুধু গল্প করতে এসেছো, তাই তোমায় বললাম এসব কথা।

পাপিয়ার গাল দুটো একটু লাল হোলো। শুনতে ভালো লাগলো এই কথাগুলো। কাজল তাকে একথা বলেছে, বিশ্বাস করবে তার কলেজের সহপাঠিনীরা ?

কাজল আস্তে আস্তে বললো,—তোমায় আমার কিরকম মনে হচ্ছে বলবো ? ঠিক বন্ধুর মতো।

পাপিয়া খুব খুশী হয়ে গেল। বিনুনী দুলিয়ে বলে উঠলো, বন্ধু ? সত্যি ? সত্যি-সত্যি ? বেশ, আমরা বন্ধু।

কাজলেরও খুব ভালো লাগলো। খুব হাল্কা মনে হোলো নিজের হৃদয়খানি।

খাওয়া শেষ হোলো। বেয়ারা বিল আনলো। কাজল পকেট থেকে বার করলো তার ভারী মানিব্যাগ।

পাপিয়া চোখ পাকিয়ে দেখলো, ব্যাগের মধ্যে একতাড়া একশো টাকার নোট।

কাজল একটি নোট বার করলো, কলেজের ছাত্র যেমনি করে একটি ফুলস্ক্যাপ পাতা বার করে দেয় পাশের ছেলেটিকে। বিল মিটিয়ে বেয়ারাকে টিপ্‌স্ দিলো একটি পাঁচ টাকার নোট।

পাপিয়া স্তম্ভিত হোলো। তার বাবার বেশ স্বচ্ছল অবস্থা—চেনাশোনার মধ্যে ধনী ঐশ্বর্য্যবানও অনেক আছে। কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে এতটা নিস্পৃহভাব সে কারো মধ্যে দেখেনি।

একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা আপনারা টাকার মমতা করেন না ?

কাজল হাসলো। বললো—কোনো ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করো, সে বলবে—টাকা ধরে না রাখলে টাকা বাড়ে না। কিন্তু কোনো শিল্পীকে জিজ্ঞেস করো,—সে বলবে, টাকা খরচা না করলে টাকা বাড়ে না।

সে কি করে হয় ?—পাপিয়া হেসে ফেললো।

—ব্যবসায়ী তার নিজের টাকা বাড়ানোর কথাই ভাবে। শিল্পী ভাবে দেশের টাকা বাড়ানোর কথা। ব্যবসায়ী তোমার পকেটের টাকা তার নিজের পকেটে পুরে নিজের টাকা বাড়ায়। কিন্তু শিল্পী ভাবে দেশের লোকের ধনদৌলত যদি বাড়ে, তার নিজের রোজগারও আরো বাড়বে। কারণ আমি যেটা খরচ করলাম, সেটা তক্ষুনি হয়ে গেল আরেকজনের রোজগার। আমি যদি খরচা না করি, আরেকজনের রোজগারও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। রোজগার বন্ধ হলে তার খরচা কমবে, তখন অন্য লোকের রোজগারও বন্ধ। এভাবে রোজগার বন্ধ হতে থাকলে, মনে করো, লোকে যদি সিনেমা দেখা বন্ধ করে, যদি সিনেমা দেখা কমিয়ে দেয়, তখন আমারও রোজগার বন্ধ। ওই বেয়ারাকে আমি যদি চার আনা টিপ্‌স্ দিতাম, ও সেটা দিয়ে তার বিড়ির দোকানের ধার শোধ করতো। ওকে পাঁচ টাকা দিলাম, ও দশ-দশ আনা খরচা করে আমার দুটো তিনটে বই দেখবে।

কাজলের কথা শুনে পাপিয়া খুব হাসতে লাগলো।

॥ দশ ॥

বাইরে বেরিয়ে কাজল জিজ্ঞেস করলো,—এখন কোথায় যাবে, বলো।

বেলুড় মঠে,—পাপিয়া উত্তর দিলো।

কাজল অবাক হোলো।—সেখানে কি করবে?—জিজ্ঞেস করলো সে।

—ওখানে গঙ্গার পাড় খুব নিরিবিলি। ঘাসের উপর বসে গল্প করবো।

বেলুড়ে গিয়ে গঙ্গার পাড়ে দুজনে পাশাপাশি বসলো।

আমার অনেক কথা বলেছি,—কাজল বললো,—এবার তোমার কথা বলো।

আমার কথা বলবার মতো এমন কিছু নয়,—উত্তর দিলো পাপিয়া,—আমায় যা দেখছেন, যতোটুকু দেখছেন, এর বেশী কিছু আমি নই। বাবা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। মা রান্নাবান্না করেন। আমি কলেজে যাই। বাবা আমার জন্যে একটি ছেলে ঠিক করেছেন। ব্যস্, এই আর কি।

—তারপর?

—তারপর আবার কি? বিয়ে হবে। শ্বশুর বাড়ি যাবো। শ্বশুরের ছেলে দিনের বেলা অফিসে যাবে। আমি ঘুমুবো। সন্ধ্যেবেলা চা করবো, রান্নাবান্না করবো, শনিবার-রোববার সিনেমা দেখবো।

—তোমার জীবনে কিছু করতে ইচ্ছে করে না?

বলেছি তো।—একটু চুপ করে রইলো পাপিয়া। তারপর বলে গেল,—কিন্তু কী লাভ? ওসব হবে না।

—সত্যি সত্যি কি ইচ্ছে করে তোমার?

—গানটা ভালো করে শিখেছি। আরো ভালো করে শিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে হবে না। বাবা পছন্দ করেন না। কলেজের ফাংশানে, আর বাড়িতে আমায় যারা দেখতে আসে তাদের সামনে ছাড়া বাবা আমায় আর কারো সামনে গান গাইতে দিতে চান না।

কাজল একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো,—সিনেমায় নামতে ইচ্ছে করে?

আমার এই চেহারা নিয়ে?—পাপিয়া হেসে ফেললো।

—তোমার চেহারা ক্যামেরায় খুব ভালো আসবে।

পাপিয়া আরো হাসতে লাগলো।

সত্যি বলছি,—বললো কাজল,—সিনেমায় যারা নামে, তাদের অনেকের চেহারা তোমার চাইতে বেশী ভালো নয়।

পাপিয়া হাসতে হাসতে বললো,—থাক, আমায় আর আকাশে তুলতে হবে না। কোনো লাভ নেই। অন্য কাউকে গিয়ে এসব কথা বলবেন।

—আমি যদি তোমায় সিনেমায় চান্স পাইয়ে দিই?

—আমার তো এখনো মাথা খারাপ হয়নি।

কাজল খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা, তুমি তো গান গাইতে পারো। প্লে-ব্যাকে গান গাইবে?

আপনার ঠোঁট মেলানোর জন্যে যদি আমার গলা হলে চলে, তাহলে আপত্তি নেই। তা নইলে নয়,—বলে পাপিয়া মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

কাজল প্রথমে একটু মুচকি হাসলো। তারপর হঠাৎ কি যেন ভেবে খুব জোরে হেসে উঠলো।

পাপিয়া হাসিমুখে মুখ নিচু করে রইলো।

পাপিয়া, তুমি ভীষণ দুষ্টু,—বললো কাজল।

সবাই তো তাই বলে,—আস্তে আস্তে উত্তর দিলো পাপিয়া।

কাজল আর কোনো কথা বললো না।

চোখ মেলে দূরের আকাশ দেখছিলো সে। অনেক বড়ো আকাশ। একপাশে স্থির নিশ্চল হয়ে দু-টুকরো তুলোটে মেঘ। একটি নিঃসঙ্গ চিল উড়ে বেড়াচ্ছে মেঘের ওপাশে।

সামনে প্রশান্ত গঙ্গা। ঝিলমিল স্রোত বয়ে চলেছে একটানা। দুটো নৌকো নদী বেয়ে একটি আরেকটিকে পেরিয়ে দু-দিকে চলে গেল।

বালি ব্রিজের উপর দিয়ে গমগম করে চলে গেল একটি মাল-গাড়ি। ট্রেনের বাঁশি মিলিয়ে গেল অনেক দূরে।

পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো,—কী ভাবছেন?

কিচ্ছু না,—উত্তর দিলো কাজল,—শুধু দেখছি। এরকম আকাশ, এরকম মেঘ, রোদ্দুর, নদীর ঢেউ, অনেকদিন দেখিনি। বাইরে গেছি অনেকবার,—কিন্তু সে শুধু আউটডোর শুটিংএ! পর্দার উপর যা সব দেখতে পাও নিরিবিলি নির্জন দৃশ্য, ছবি তোলবার সময় সে যে কি রকম মাছের বাজারের মতো ব্যাপার, ভাবতে পারবে না। আজ এখানে তোমার পাশে নিরিবিলি বসে মনে হচ্ছে, জীবনে কতো ফাঁক পড়ে আছে।

পাপিয়া হাসলো। হাত দিয়ে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো,—দুদিন পরে যখন আবার আরেকজনের পাশে নিরিবিলি বসবেন, তখন আজকের ফাঁক আর অতো বেশী মনে হবে না। তখন কথাটা সেদিনের মতো আবার নতুন করে মনে হবে।

কাজল হেসে ফেললো। তারপর সহজ গলায় বললো,—সারাটা দিন এখানে বসেই কাটাবে নাকি? ওই দেখ একদল লোক বেলুড় দেখতে এসেছে।

পাপিয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো।

ওরা এখানে এসে আমায় দেখে ফেললে আমার ভয়ানক অসুবিধে হবে কিন্তু,—বললো কাজল।

বেচারা ফিল্মস্টার!—পাপিয়া কপট করুণায় বললো,—আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ওই নৌকোটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, ও ভাড়া যাবে কিনা।

—কোথায় আবার যেতে চাও?

—কোথাও না। গঙ্গার বুকে একটুখানি নৌকো চড়ে বেড়াবো।

দুজনে নৌকোয় মুখোমুখি বসলো। পাপিয়া চিনেবাদাম কিনেছিলো এক ঠোঙা। ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দুজনে তাই খেতে লাগলো।

আপনি বড্ড একলা,—না?—পাপিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

কাজল হাসলো। একটি ছায়া ভেসে গেল তার মুখের উপর দিয়ে এক নিমেষের জন্যে। সেটা পাপিয়ার চোখ এড়ালো না।

—আপনি বিয়ে করেননি কেন?

কাজল সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো,—এমনি।

—এবার একটি করে দেখুন, কেমন? নেমন্তন্ন করবেন তো? তবে যেদিন আমার বিয়ে, আপনিও ঠিক সেই দিনই করবেন না কিন্তু। তাহলে আমার নেমন্তন্নও আপনি খেতে পারবেন না, আপনার নেমন্তন্নও আমি খেতে পারবো না।

কাজল হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

কোনোদিন কারো সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিলো?—খুব ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলো পাপিয়া,—বলুন না!

একবার দুবার?—কাজল হাসতে হাসতে বললো,—কতোবার। তার কি হিসেব আছে?

—বাজে কথা বলবেন না। ওসব তো এমনি, মিছেমিছি। আমি বলবো? একজনের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিলো একবার। সে অনেকদিন আগে।

কাজল একটু অবাক হয়ে তাকালো পাপিয়ার দিকে।

পাপিয়া বলে গেল,—আপনি ভাবছেন একথা তো কোনো

সিনেমা ম্যাগাজিনের জীবনকাহিনীতে লেখেনি, আমি কি করে জানলাম? কিন্তু জানেন, আমি গুণতে জানি। সত্যি করে বলুন, আমি ঠিক বলিনি?

কাজল হেসে ফেললো। জিজ্ঞেস করলো,—তারপর?

—তারপর আর কি? চিরকাল যা হয়—। মেয়েটি আপনাকে কাঁচকলা দেখিয়ে সরে পড়েছে।

কাজল হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিলো। একটু পরে আবার মুখ ফিরিয়ে বললো,—কাঁচকলা আমিও অনেককে দেখিয়েছি।

—সেই রাগে। তাই না? মুখ টিপে হেসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

কাজল কোনো উত্তর দিলো না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাপিয়া বললো,—রাগ করলেন আমার উপর?

রাগ? না, একটুও না,—সহজ হবার চেষ্টা করে কাজল বললো,—রাগ করবো কেন? তুমি ঠিকই বলেছো। তবে, আমার মনে কোনো আক্ষেপ নেই সেই ব্যাপারে। ওরকম জীবনে হয়।

কাজল একটু যেন উদাস হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো দূরের দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে। তারপর বললো,—একথা আমি কাউকে কোনোদিন বলিনি। আজ তোমায় বলতে ইচ্ছে করছে। কেন ইচ্ছে করছে জানিনা। বোধহয়, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব সহজ বলেই।

এ তো শুধু একদিনের সম্পর্ক,—পাপিয়া উত্তর দিলো,—এর পর আমাদের দেখা নাও হতে পারে। সুতরাং আমায়ও নাই বা বললেন।

—না, আমায় বলতে দাও। তোমার মতো আর কারো সঙ্গে কোনোদিন আমার দেখা হবে না, বলাও হবে না।

বেশ, বলতে যদি ইচ্ছে হয় তো বলুন। আমার কিন্তু একটুও শুনতে ইচ্ছে করছে না।—পাপিয়া পা ছড়িয়ে বসলো।

হাতটা নামিয়ে দিলো নদীর জলে। চলতি নৌকার সঙ্গে হাতখানিও যেন জল কেটে চলতে লাগলো।

অনেক বছর আগেকার কথা,—কাজলের কথাগুলো যেন গাঙের হাওয়ায় নদীর ওপার থেকে ভেসে এলো,—আমি তখন চাকরি করি। আমাদেরই অফিসে চাকরি করতো আরেকটি ছেলে। তারই বোন যাওয়া-আসা ছিলো, ভাবও হোলো। বিয়ের কথা উঠলো। সেও রাজী হোলো, আমিও রাজী হলাম। সিনেমার গল্পের মতো নয়। খুব সাধারণ গেরস্ত বাড়ির সাধারণ ঘটনা। চাঁদের আলো নয়, লেকের পাড় নয়, পার্ক স্ট্রীটের ফ্যাসানদুরস্ত রেস্তোঁরা নয়। শুধু বারান্দার এক পাশে, মোড়ের ট্রাম-স্টপে, নয় তো বা ওদের বাড়ির ছোট্টো একটুখানি রান্না ঘরে বসে সাধারণ গল্প করা। হাত ধরা নয়, কাছে টেনে আনা নয়, শুধু সাধারণ গল্প। এপাশে ওপাশে ওর মা, কাকী, পিসী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরই নজর এড়িয়ে শুধু একটু একটু তাকানো। আর, সব কিছু জানানো সেই একটু তাকানোর মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম একদিন, —আমায় বিয়ে করবে? সে, বললে,—হ্যাঁ। ওর মা বাবাকে বললাম। ওরা রাজী হোলো। কী খুশি হয়েছিলাম, ভাবতে পারবে না পাপিয়া। একটুখানি ঘর, সেখানে থাকা শুধু আরেকজনের সঙ্গে, খুবই আপন একজনের সঙ্গে—এর চেয়ে বেশী মধুর স্বপ্ন বোধ হয় আর নেই।—বলতে বলতে কাজল খুব আনমনা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো পাপিয়া। যখন দেখলো কাজল চুপ করে আছে, তখন কাজলের গায়ে একটু জল ছিটিয়ে দিলো বাচ্চা মেয়ের মতো।

কাজল ফিরে তাকালো। নতুন-নতুন হাসতে শেখা দোলনার-বাচ্চার হাসির মতো মনে হোলো পাপিয়ার হাসি।

তারপর একদিন কী হোলো জানো?—আস্তে আস্তে সুরু করলো কাজল,—হঠাৎ আমার চাকরি গেল। মেয়েটি তখন কী

করলো জানো? আমার সঙ্গে দেখা হতেই আমায় এড়িয়ে যেতে সুরু করলো। আর কিছুদিন পরে আমাদেরই অফিসের আরেকজন ছোক্‌রা কেরানীর সঙ্গে তার বিয়ে হোলো।

ভালোই হোলো,—বলে উঠলো পাপিয়া,—সেও সুখী হোলো, আপনিও সুখী হলেন।

—আমি? সেই যে আমি কলকাতা ছাড়লাম, তারপর অনেক বছর কলকাতা আসিনি। আবার যখন এলাম, তখন আমায় দেখলে রাস্তায় ভিড় হয়ে যায়।

পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো,—ওই মেয়েটি ওর স্বামীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার ছবি দেখতে যায়।

কে তার খবর রাখে,—কাজল উত্তর দিলো।

ও নিশ্চয়ই পথে ঘাটে পোস্টারে হোর্ডিং-এ, সিনেমার ম্যাগাজিনে আপনার ছবি দেখতে পায়,—পাপিয়া বলে গেল।

দেখলে দেখুক গে। আমার কি বয়ে গেল,—উত্তর দিলো কাজল।

সে মেয়েটি যেদিকে তাকায় সেদিকেই নিশ্চয়ই আপনারই ছবি,—চোখ ঘুরিয়ে বললো পাপিয়া,—আহা বেচারী, সে যতো চেষ্টাই করুক, যতো সুখে থাকুক, আপনাকে তার ভুলবার উপায় নেই। ভেবে দেখুন, আপনার জীবনে এটা কতো বড়ো সান্ত্বনা!

কাজল তাকালো পাপিয়ার দিকে।

এবং তার জীবনে,—পাপিয়া বলে, কতো বড়ো বিড়ম্বনা। আপনাকে কিছুতেই ভুলে যাওয়ার উপায় নেই।

কাজল হেসে ফেললো। বললো—মনে রাখতে চায় রাখুক, ভুলে যেতে চায় ভুলে যাক। আমার কিছু আসে-যায় না। আমি তাকে ভুলে গেছি। আজ তুমি হঠাৎ কথাটা পাড়লে বলেই মনে পড়লো।

পাপিয়া হাসতে লাগলো।

কাজল শুধু তাকালো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

আপনি একটুও ভুলতে পারেন নি,—বললো পাপিয়া।

—কে বললে ভুলতে পারিনি ?

—মুক্তাবাঈ, নন্দিতা চৌধুরী, অরুণা যোশী,—এদের সবার উপর আপনি সেই মেয়েটির ব্যবহারের শোধ নিয়েছেন।

—নন্দিতা, অরুণা ? ওদের নাম তুমি জানলে কোত্থেকে ?

—যাদের খুব নাম হয়ে যায়, তাদের অনেক কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। আমি আর কার কাছে শুনবো, আমাদের কলেজের মেয়েদের কাছেই শুনেছি। দিল্লীর শান্তা নামে সেই মেয়েটি, আমেদাবাদের কোটিপতি মেয়ে ইন্দিরা, আসানসোলের প্রমীলা, টাটানগরের সেই পার্শী মহিলা, কলকাতার সেই ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের স্ত্রী—আর তামসী মজুমদারকে তো চোখের সামনেই দেখলাম। নৈনিতালের সেই মহিলাকে নিয়ে যে মামলা হয়ে গেল সেটা কাগজে না বেরোলেও কলেজের ছেলেমেয়েদের কানে ঠিক এসে যায়। শিলং-এর এক ভদ্রমহিলার স্বামী যে আপনাকে গুলি করতে গিয়েছিলেন, সে খবরও আমরা উপভোগ করেছি খুব। তারপর—

—ব্যাস, ব্যাস, আর বলতে হবে না, কাজল বলে উঠলো।

—কেন ?

—তোমার মুখে এসব শুনতে ভালো লাগছে না।

—আচ্ছা, আর না হয় নাই বললাম, উত্তর দিলো পাপিয়া, —কিন্তু এসব কার উপর রাগ করে করছেন বলুন তো ?

—কার উপর রাগ করবো ? রাগ আমার কারো উপর নেই।

—নেই ? আপনার যতো রাগ সেই মেয়েটির উপর। আপনার চাকরি চলে গেল বলে আপনাকে বিয়ে না করে যে আরেকজনকে বিয়ে করে বসলো, সেটা আপনার মনে লেগেছিলো খুব।

—দেখ, ওর জন্যে আমার—

—হ্যাঁ, ওর জন্যে আপনার মনে ভালোবাসা একটুও নেই, সে কথা জানি। ও আপনার আত্মসম্মানে এরকম ঘা দিয়েছিলো

যে ওর জন্যে আপনার কোনো ভালোবাসা থাকা অসম্ভব। কিন্তু অতো বড়ো একটি পরাজয় আপনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না।

কাজল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

পাপিয়া বলে গেল,—তাই যখনই আপনার সঙ্গে কোনো নতুন মেয়ের আলাপ হয়েছে, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই মেয়েটিকে। যখনই কোনো একজনের সঙ্গে আপনার ভাব হয়েছে, আপনি তাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন, কিন্তু মনে মনে সেগুলো বলেছেন সেই প্রথম মেয়েটিকে উদ্দেশ করে। তাই ওরা প্রত্যেকে আপনাকে বিশ্বাস করেছে, আপনার কোনো কিছু তাদের অভিনয় বলে মনে হয়নি।

কাজল একটু মুচকি হাসলো। কিন্তু দেখলো পাপিয়ার মুখখানি ঠিক আকাশের মতো।

শুনলো পাপিয়া বলছে,—তারপর আপনি হৃদয়হীনের মতো সরে এসেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই, সরে এসেছেন নিজের মনকে এই বুঝিয়ে যে, প্রথম মেয়েটির উপর আপনি শোধ নিলেন। প্রত্যেক মেয়েই আপনার কাছে সেই প্রথম মেয়ে, তাকেই আপনি খুঁজে পেতে চান সবার মধ্যে, আর তাকেই আপনি বার বার আঘাত দেওয়ার খেলা করছেন আপনার নিজের মনের মধ্যে।

কাজল হাসতে হাসতে বললো,—তোমার মুখে কথাগুলো বড্ড পাকা পাকা শোনাচ্ছে। তোমার বয়েস কতো? উনিশ কি কুড়ি —না? আমি যে তোমার চাইতে চোদ্দো পোনেরো বছরের বড়ো, সে খেয়াল আছে?

পাপিয়া এ কথার উত্তর দিলো না। হাত বাড়িয়ে নদীর জল ঝাপটালো একটুখানি। তারপর বললো,—এসব আপনি বেশীদিন পারবেন না। আপনি তো সত্যি সত্যি সারাজীবন একলা থাকতে চান না। আপনি কোথাও বাঁধা পড়তে চান। একদিন দেখবেন নিজের অজান্তেই কোথাও জড়িয়ে পড়েছেন।

কাজল একটা হাল্কা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেল। চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তার পর জিজ্ঞেস করলো,—আমার এতকথা তুমি বুঝলে কি করে ?

পাপিয়া তাকালো কাজলের দিকে, তাকালো তার খুব শান্ত চোখ তুটো তুলে। বললো,—এত কথা মেয়েরা বুঝতে শেখে না ? আমার বয়েসে সবই বুঝতে শেখে।

কাজল একটি সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে রইলো অপসৃয়মান ধুম্রকুণ্ডলির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা পাপিয়া, তুমিও কাউকে ভালোবাসো নাকি ?

—তা একটু-একটু বাসি, তুষ্টু-তুষ্টু চোখে তাকিয়ে পাপিয়া উত্তর দিলো।

—কাকে ? কে সে ?

—সেকথা আপনাকে বলবো কেন ?—চলুন এবার বাড়ি যাই।

কাজল জিজ্ঞেস করলো,—এত তাড়াতাড়ি ?

—হ্যাঁ।

—তোমায় একটা অনুরোধ করবো ভাবছিলাম।

—কি ?

—একটি গান শোনাও।

আমার গান শুনলে তো আপনার মাথা ধরে,—বললো পাপিয়া,—আপনি এ পাড়ার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় বাড়ি নিতে চান।

—মাথা ধরে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা তোমার রেওয়াজ শুনলে। এখানে এই গঙ্গার বুকের উপর নৌকোয় তোমার পাশে বসে তোমার গান শুনলে মাথা ধরবে না, শুনতে বেশ ভালো লাগবে।

—এই দৃশ্য আপনার কোন বইতে দেখেছিলাম ? পাপিয়া ভান করলো যেন খুব ভাবছে, তারপর বললো,—কোন্ বইতে দেখিনি ? সব বইতেই তো আপনি চাঁদের আলোয় নদীর বুকে

নৌকোর মধ্যে নায়িকার পাশে বসে হয় তার গান শোনেন নয় আপনার গান শোনান।—কিন্তু আমি তো ওসব নায়িকাদের মতো হাত পা নেড়ে, শরীর দুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে গান গাইতে পারবো না।

—দরকার নেই। তুমি এমনি গান শোনাও।

—না, শোনাবো না।

—আমার এই অনুরোধ রাখবে না?

—না। আমাদের এই ঘুরে বেড়ানো, অন্য কাজ থেকে ছুটি নিয়ে একসঙ্গে সময় কাটানো, এসব সিনেমার গল্প নয়। যদি আমার গান শুনতে চানতো সন্ধ্যেবেলা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। সে সময় আমি ওস্তাদজীর কাছে গান শিখি!—এবার বাড়ি চলুন।

বাড়ি থেকে একটু দূরে বড়ো রাস্তার এক পাশে কাজল পাপিয়াকে নামিয়ে দিলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আবার কবে দেখা হবে?

—কক্ষনো না, পাপিয়া উত্তর দিলো।

—আমি কাল সকালে বম্বে চলে যাচ্ছি। হয়তো মাস দুয়েক পরে আবার আসবো। তবে কিছু ঠিক নেই, ছ-মাসও হতে পারে।

পাপিয়া খুব সহজভাবে হাসলো। হেসে উত্তর দিলো,—হয়তো মাস দুয়েক পরে আমি থাকবো শ্বশুর বাড়ি!

কাজল চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর উত্তর দিলো,—যাক, দেখা যদি না হয় তো নাই বা হোলো। কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়, আবার তাদের ভুলেও যাই। তারাও ভুলে যায় আমায়। না হয় তুমিও তাদেরই একজন।

পাপিয়া হাসতে হাসতে বিনুনি দুলিয়ে উত্তর দিলো,—তাদের একজন তো বটেই।

কাজল বলে গেল,—তবে একটা কথা শুনলে তুমি খুশি হবে।

—কি কথা?

কাজল একটু থামলো। হয় তো বা ভাবলো কথাটা বলবে কি বলবে না। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো সে। খুব ঝলমল করে উঠলো তার মুখখানি।

—কি কথা? পাপিয়া আবার জিজ্ঞেস করলো।

কাজল আস্তে আস্তে বললো,—আজ একটি দিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। এত ভালো সময় আমার আর কারো সঙ্গে কাটেনি কোনো দিন।

পাপিয়ার চোখ দুটি খুব স্নিগ্ধ হয়ে গেল গোধূলির আকাশের মতো। খুব সহজ হাসি হেসে সে চোখ তুলে বললো,—হ্যাঁ, আমারও খুব ভালো লেগেছে।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো।

তারপর পাপিয়া বললো,—আচ্ছা এখন যাই।

এসো,—কাজল বললো খুব আস্তে আস্তে।

রাত্তিরে মনোরমা মেয়েকে খেতে ডাকতে এসে দেখলো, পাপিয়া বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

—পাপিয়া!

—কী মা?

—খাওয়ার জায়গা দেওয়া হয়েছে। চল।

—না মা, আমি খাবো না, বালিশ থেকে মুখ না তুলেই পাপিয়া উত্তর দিলো।

—কেন রে?

—শরীরটা ভালো নেই, বললো পাপিয়া।

মা কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলো। দেখলেন গা তো গরম নয় একটুও, বেশ ঠাণ্ডা।

মেয়েকে জোর করে একটু দুধ খাইয়ে দিলেন মনোরমা! তারপর এক গেলাস জল টেবিলের উপর ডিস চাপা দিয়ে রেখে চলে গেলেন দরজাটা ভেজিয়ে।

মা চলে যেতে পাপিয়া মুখ তুললো। উঠে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলো।

তারপর বিছানায় ফিরে এসে বালিশের তলা থেকে বার করলো একটি সিনেমা-মাসিক।

পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামলো।

সেখানে কাজলকুমারের একটি ফুল-পেজ ছবি।

কাজল মিনিট পনেরো কুড়ি এ রাস্তায় এলোমেলো গাড়ি চালিয়ে তারপর বাড়ি ফিরে এলো। ভেবেছিলো চেনা শোনা কারো বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাবে। কিন্তু সারাদিনের সমস্ত মুহূর্তগুলো একটা মধুর রেশ রেখে গিয়েছিলো তার মনে। মনে হোলো অন্য কোথাও গেলে যেন এই আমেজটা কেটে যাবে। তাই আর কোথাও না গিয়ে চুপচাপ বাড়িই ফিরে এলো সে।

নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলো। তারপর উঠে গিয়ে চান করে নিলো। অনেকটা সময় নিয়ে।

চাকর চা করে এনে দিলো। চা খেতে খেতে কাজলের হঠাৎ মনে পড়লো, তাই তো, কাল সকালে তো বম্বে যেতে হবে। জামা-কাপড় এই বেলা গুছিয়ে না রাখলে বড্ড তাড়াহুড়ো করতে হবে শেষ মুহূর্তে।

আলমারি খুলে সে জামা-কাপড় বার করে ভরতে লাগলো একটি বড়ো স্যুটকেশে।

কখন যেন আনমনা হয়ে গেল একটুখানি।

তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলো। জামা-কাপড় গুছোনো শেষ হতে স্যুটকেশ বন্ধ করে মুখে একটি নিশ্চিন্ত ভাব ফুটিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভাবলো একটুখানি। তারপর টেলিফোন তুলে, নম্বর ঘুরিয়ে,

গলার সাড়া পেতে বললে,—কে? চন্দ্রিমা? কি করছো? —ক্লাবে যাবে? —আচ্ছা, তৈরী হয়ে নাও, আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

টেলিফোন ছেড়ে দিলো কাজল। আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

তখন সন্ধ্যে অতীত হয়ে রাত হয়ে আসছে একটু একটু করে। দূরের পানের দোকানের সামনে জটলা করছে কয়েকজন ঝি-চাকর। দক্ষিণ-পাড়ার পথ নির্জন হয়ে এসেছে এরই মধ্যে, রাস্তা দিয়ে চানাচুরওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে।

কাজল তাকিয়ে দেখলো, ওধারে পাপিয়ার জানলায় আলো জ্বলছে।

কতক্ষণ সে তাকিয়েছিলো, খেয়াল নেই। পাপিয়া গান শিখছিলো ওস্তাদের কাছে, তাই শুনছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক সময় থেমে গেল সেই গান। তারপর কখন যেন নিভে গেল পাপিয়ার জানলার আলো। কাজল কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেই অন্ধকার জানলার দিকে।

তারপর হঠাৎ ঘড়িতে সময় দেখলো।

হঠাৎ মনে পড়লো যে, চন্দ্রিমা নামে কোনো একজনকে সে সময় দিয়েছে। তাড়াতাড়ি এসে টেলিফোন তুললো।

—চন্দ্রিমা! —শোনো, আমি হঠাৎ একটি বিশেষ কাজে আটকে গেলাম। —না, আজ আর ক্লাবে যাওয়া হবে না। —কাল সকালে বম্বে যাচ্ছি। —হ্যাঁ, বাই এয়ার,—হ্যাঁ, একটু জরুরী কাজ —ঠিক বলতে পারছিনা, তবে হয় তো দশ পনেরো দিনের মধ্যেই ফিরবো,—হ্যাঁ, ফিরে এলে দেখা হবে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে কাজল ফিরে এলো জানলার কাছে। দেখলো পাপিয়ার জানলা তখনো অন্ধকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। সিগারেট খেলো দু-তিনটে। ঘরের মাঝখানে ফিরে এসে পায়চারি করলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার গিয়ে টেলিফোন তুললো।

—চন্দ্রিমা? —দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। আমি এক্ষুণি আসছি। —হ্যাঁ কাজটা এড়ানো গেল। তোমার সঙ্গে মাস-খানেকের মধ্যে আর দেখা হবে না, তাই ভাবলাম পড়ে থাক দরকারী কাজ, তোমার সঙ্গে কোথাও নিরিবিল বসে গল্প করি!

পরদিন সকাল হোলো। খুব ভোরে ভোরে উঠে চান-টান সেরে নিয়েছিলো সে। চাকর বেয়ারা সুটকেশ আর হোল্ড-অল্ গাড়ির পিছনে তুলে দিলো। ড্রাইভার সঙ্গে যাবে, এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তবু ড্রাইভারের সীটে কাজল নিজেই বসলো।

গাড়িতে উঠে আরেকবার পাপিয়ার জানলার দিকে তাকালো।

দেখলো জানলা বন্ধ।

তখন ঝড়ের মতো গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে কাজল চলে গেল।

॥ এগারো ॥

সেই যে কাজল ঝড়ের মতো গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল, তারপর আর কলকাতায় ফেরার ফুরসত হোলো না অনেক দিন। দু-মাস তো কেটে গেলই, তারপর তিনমাস, চারমাস করে প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেল।

পাপিয়া বি-এ পাশ করলো ইতিমধ্যে।

আর মন্মথবাবুর ছেলে ফিরে এলো জার্মানি থেকে।

কাজল চলে যাওয়ার পর পাপিয়া বিষণ্ণবোধ করেনি একটুও। একটানা দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহে যেমনি করে মাঝে মাঝে মনে পড়ে কোনো একটা পুরোনো আনন্দমুখর ছুটির দিন, তেমনি এক এক সময় মনে পড়তো কাজলের কথা,—দু-চার মুহূর্তের জন্যে। রোদ্দুরে ধোয়া আকাশের বিস্তৃত নীলিমায় যেমনি করে কয়েকটুকরো ধূসর মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে একটু ম্লান করে দেয় চারদিক, তেমনি দুটো অনন্য ছুটির দিনের স্মৃতি পাপিয়ার মনকে আচ্ছন্ন করে দিতো। কিন্তু সে বর্ষার মেঘ নয়, শুকনো ঋতুর যাযাবর মেঘ, কেটে যেতো কিছুক্ষণের মধ্যেই, চারদিক আবার রোদ্দুরে ঝিলমিল করে উঠতো। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতো পাপিয়া,—বাবার জন্যে চা-করা, দৈনন্দিন বাজারের হিসেব রাখা, ধোবার কাছ থেকে কাপড় বুঝে নেওয়া, ঘর-গেরস্থালির কাজে মায়ের সহায়তা করা, এই সব।

কখনো কখনো মনের জানলায় কোনো অবুঝ ব্যাকুলতা দখিন হাওয়ার মতো দমকা হয়ে উঠতো, তানপুরো তুলে তখন গান গাইতে বসতো পাপিয়া, গানের ঝড় যখন শেষ হোতো, স্তব্ধ নিথর প্রশান্ত হয়ে যেতো অন্তরের সমস্ত দিশা। অলস দুপুরের মতো ঘুম নামতো চোখে।

কখনো বা ঘুম ভাঙবার পর বালিশের তলা থেকে বার করতো *সচিত্র সিনেমা-মাসিক। আনমনে উল্টে যেতো পাতার পর পাতা।* কোনো একটা চেনামুখের ছবি চোখে পড়লে আনমনা দৃষ্টি সজাগ হয়ে থেমে যেতো কিছুক্ষণের জন্যে। মুখে স্ফুরিত হোতো একটুখানি হাসি, তারপর আবার পাতা উল্টে যেতো, মনোনিবেশ করতো মাসিকপত্রের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে।

এক একদিন বন্ধুরা আসতো,—দীপ্তি, মঞ্জু, অনীতা, আরো অনেকে। মাকে বলে তাদের কারো না কারো সঙ্গে যেতো সিনেমায়। হয়তো সেই ছবিতে যে নায়ক সে পাপিয়ার কোনো এক হারানো ছুটির দিনের ক্ষণিকের বন্ধু, প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে সে হাসতো নিজের মনে। সিনেমার শেষে পথ চলতে চলতে কিংবা কারো না কারো বাড়িতে হয়তো প্রচুর আলোচনা ছবির নায়ককে নিয়ে। সেও আলোচনায় যোগ দিতো অন্যান্য সবার মতো, হৈ চৈ করতো, প্রচুর হাসতো, সমালোচনা করতো।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতো দীপ্তি কিরকম অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পাপিয়া গায়ে মাখতো না। হয়তো কাজলের গল্প বন্ধুদের কাছে পড়া যেতো, প্রাণভরে হাসা যেতো তাদের সঙ্গে, ইচ্ছেও করতো মাঝে মাঝে,—কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে যেতো, তখন আর কিছুতেই বলতে চাইতো না তার মন।

এ একেবারে আমার একলার কথা, আমার কাছেই গোপন থাক, কি হবে কাউকে জানিয়ে,—ভাবতো পাপিয়া।

বি-এর রেজাল্ট বেরোলো। বন্ধুদের অনেকেই গেল এম-এ পড়তে। পাপিয়ারও খুব ইচ্ছে হয়েছিলো। মা বললেন, কী আর হবে এম-এ পড়ে। বাবা বললেন,—পড়ুক না, ক্ষতি কি ? যে-কদিন পড়তে পারে পড়ুক

তখন পাপিয়ার হোলো অভিমান। মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। শুধু বললো,—থাক, এম-এ আর পড়বো না।

নীহারবাবু প্রায়ই যাচ্ছেন মন্মথবাবুর বাড়ি। গোপনে সলা-

পরামর্শ করছেন পাপিয়ার মায়ের সঙ্গে একলা বসে। পাপিয়ার চোখে পড়ে সবই।

ঠিক আছে,—পাপিয়া ভাবতো,—এমনই তো হয়।

চুপচাপ নিজের মনে সেলাই নিয়ে বসতো।

মনোরমা একদিন একটি ছবি এনে দেখালেন পাপিয়াকে। সে বুঝতে পারলো। কোট-টাই পরা সাধারণ একটি চেহারা, বুদ্ধির দীপ্তি আছে চোখে। এক নজর দেখে ছবিটা সরিয়ে রাখলো। পাপিয়ার চোখে মুখে একটা নিস্পৃহ ভাব, তার বয়েসী মেয়েরা সাধারণত একটু লজ্জা পায় এ অবস্থায়, কিন্তু তার বিন্দু-মাত্র আভাস নেই পাপিয়ার মুখে।

মনোরমার চোখ এড়ালো না। তাঁর মনে একটু ভাবনা হোলো। মেয়ে একটুখানি কুণ্ঠা প্রকাশ করলে তিনি খুশী হতেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন,—তোর পছন্দ হয়নি?

পাপিয়া সহজভাবে উত্তর দিলো,—পছন্দ অপছন্দের কি আছে মা? তোমরা পছন্দ করেছো, তাই যথেষ্ট।

এই সহজ উত্তরও মনোরমার ভালো লাগলো না। মনে মনে একটু রাগ হোলো। সে রাগ প্রকাশ না করে শুধু বললেন,—ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, বিদেশ ঘুরে এসেছে, সম্ভ্রান্তবংশ, বাড়ির অবস্থা ভালো, খুঁজলে এরকম ছেলে কটা পাওয়া যায়, বল?

সে কথা যে পাপিয়া বোঝে না তা নয়। কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

ওরা যে আমাদের এখানে সম্বন্ধ করতে রাজী হয়েছে—মনোরমা বলে গেলেন,—সে আমাদের ভাগ্যি।

পাপিয়া তার নিরাসক্ত গাম্ভীর্যের উপর হাল্কা ছেলেমানুষীর মুখোস পরাবার চেষ্টা করলো। চোখ পাকালো সে, বলে উঠলো,—বটে! আর আমরা যে তাদের ওখানে মেয়ে দিতে রাজী হলাম, সে ওদের ভাগ্যি নয়?

মেয়েরা ছলনা মাকে ফাঁকি দিতে পারলো না, তবু না হেসে পারলেন না মনোরমা। বললেন,—সে পরে বোঝা যাবে, এখন তুই যদি বলিস তো কথা পাকাপাকি করে ফেলি।

আমি যদি বলি?—পাপিয়া অবাক হোলো।—আমি কিছু বলতে যাবো কেন, বা রে? তুমি আছো, বাবা আছেন।

—ছেলে বলেছে, তোর যদি মত হয়, তবেই সে বিয়েতে মত দেবে, তা নইলে নয়।

ছেলে বলেছে ও কথা?—পাপিয়া চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। হেসে ফেললো সে। বললো—কতো টাকা পণ চাইছে?

মনোরমা বুঝতে পারলেন যে, মেয়ে আর সেই ছেলেমানুষটি নেই। ওর মনের বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। পাপিয়ার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না তিনি, শুধু বললেন,—ওরা রোববার দিন তোকে দেখতে আসবে।

—এত বছর ধরে এপাড়ায় আছে, নতুন করে আবার কি দেখবে?

একথার উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লেন মনোরমা।

দীপ্তি এসে উপস্থিত হোলো একদিন।

—হ্যাঁ রে পাপিয়া, তোর নাকি বিয়ে?

পাপিয়ার বুক হঠাৎ টনটন করে উঠলো, কিন্তু মুখে খুব দুষ্টু হাসি হেসে বললো,—যাঃ, কে বললে? যতো সব আজে বাজে কথা।

—এই মাত্র মাসীমা নিজে বললেন। জার্মানী ফেরত ইঞ্জিনিয়ার ছেলে···।

—আমার ভারী বয়ে গেছে ওকে বিয়ে করতে।

—রোববার দিন তোকে নাকি দেখতে আসছে?

—এলোই বা। এমন মুখ করে বসে থাকবো যে ছেলে আর ছেলের বাপ তক্ষুনি কেটে পড়বে।

দীপ্তি কি যেন ভাবলো, একটু তাকিয়ে দেখলো পাপিয়ার

দিকে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো,—তোর বুঝি বিয়েতে মত নেই ?

—আমার মত দিতে বয়ে গেছে।

—তা হলে ?

—তাহলে আবার কি ?

—ওঁরা বুঝি জোর করে বিয়ে দিচ্ছেন ?

—জোর করে বিয়ে দিতে যাবেন কেন ? বিয়ে এক জায়গায় হলেই হোলো, সে ওঁদের যেখানে খুশী।

—ছেলে তো খুবই ভালো।

—আমি কি খারাপ নাকি ?

তোর সত্যি সত্যি মত আছে এ বিয়েতে ?—দীপ্তি জিজ্ঞেস করলো।

পাপিয়া একথার উত্তর দিলো না। বললো—তোর সুবিমলের কি খবর বল।

দীপ্তি একটু হাসলো।

সুবিমল ভালোই আছে,—বললো সে,—এখানকার প্রোডাক্শানে কাজ করছে সে। ওর একটা বাঁধা রোজগারের ব্যবস্থা হোলো এদ্দিনে।

—ওর সঙ্গে দেখা হয় ?

দীপ্তি একটু আরক্ত হোলো। হেসে মুখ নিচু করে বললো,—হ্যাঁ, হয়।

—ওর সঙ্গে বাইরে বেরোস ?

—হ্যাঁ।

—দাঁড়া, একদিন মাসীমাকে গিয়ে বলে দেবো। এমনি বকুনি দেবেন তোকে !

দীপ্তি হেসে ফেললো,—মা-বাবা জানেন,—বললো সে, ওঁদের বলেছি।

—ও মা, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। ও বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে।

পাপিয়া দীপ্তির গাল টিপে জিজ্ঞেস করলো—এমনি করে কদিন চলবে?

—বেশীদিন নয়।

—তা'হলে?

—তা হলে আবার কি? মা-বাবা রাজী হয়েছেন। সামনের মাসে আমাদের বিয়ে।

শুনে পাপিয়া খুব খুশী হোলো। এ শুধু বন্ধুর বিয়ে শুনে খুশী হওয়া নয়, তার চাইতেও যেন অনেক বেশী। সে বুঝতে পারলো না কেন এত ভালো লাগলো দীপ্তির কথা শুনে।

দীপ্তি কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা, কাজল-দার সঙ্গে তোর খুব ভাব হয়েছিলো বুঝি?

পাপিয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, কিন্তু সে এক নিমেষের জন্য। হেসে জিজ্ঞেস করলো,—কাজলকুমার তোর কাজল-দা, হলেন কি করে?

দীপ্তির গাল দুটো লাল হোলো। বললো,—ওরকম হয়।

—উনি সুবিমলের কাজল-দা, তাই বুঝি তোরও?

—তাই। কিন্তু তুই তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলি না?

পাপিয়া একটু চুপ করে রইলো। তারপর হেসে বললো,—উনি বেশ মজার লোক। আমার অটোগ্রাফ খাতায় একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন। দেখবি?

কাজলকুমারের লেখা কবিতা দেখবার জন্যে দীপ্তির কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না। বললো,—কেন তুই ওর সঙ্গে অতো মাখামাখি করলি?

—মাখামাখি? শুধু একদিন ওর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

—না গেলেই ভালো হোতো।

কেন? ভাই, যে যাই বলুক, আমার সঙ্গে ও খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে।

—মানলাম, না হয় করেছে। কিন্তু তুই তো মরেছিস।

আমি মরেছি?—দীপ্তির কথা শুনে পাপিয়া হেসে খুন—আমি মরেছি কি রে? আমি কি তোর মতো নাকি রে যে, সুবিমল হেসে দুটো কথা বললো বলে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে বিকিয়ে গেলাম?

দীপ্তি চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো—ছাখ, আমার কাছে লুকোস নে। আমি বুঝি টের পাইনা? কাজলদার সঙ্গে চেনা হওয়ার পর তুই যে কতো গম্ভীর হয়ে গেছিস, আমি বুঝি বুঝতে পারি না?

—গম্ভীর হয়ে গেছি? আমি?

পাপিয়া হাসতে লাগলো। ঠোনা দিলো দীপ্তির গালে, মুখে খুব দুষ্টু-দুষ্টু ছেলেমানুষী ভাব আনবার চেষ্টা করলো, তবু হঠাৎ অনুভব করলো তার চোখ ঠেলে জল আসছে।

কেন যে তুই এত বোকামি করলি,—সুরু করলো দীপ্তি।

কিন্তু তাকে থামিয়ে পাপিয়া বললো,—থাক, ওসব বলা আর কেন। আমার তো বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। ছেলের ছবি দেখবি? বেশ দেখতে। মায়ের কাছে ছবি আছে। গিয়ে দেখে আয়।

দীপ্তি একটুও আগ্রহান্বিত হোলো না। সে বাড়ি চলে গেল।

আমি গম্ভীর হয়ে গেছি?—ভাবলো পাপিয়া,—একটুও না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করে গান গাইলো, বাড়িময় লাফিয়ে বেড়ালো, আচার চুরি করে খেলো, বাবার কাছে গিয়ে আব্দার করলো, মাকে জ্বালালো, বুড়ো চাকর রামুর সঙ্গে ঝগড়া করলো,—তারপর হঠাৎ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে।

মনোরমা এক সময় ঘরে ঢুকে দেখলেন পাপিয়া বোম্বের একটি রংচঙে সিনেমা-সাপ্তাহিক খুলে তন্ময় হয়ে এক ফিল্মস্টারের ছবি দেখছে। কোনো কথা না বলে চুপচাপ ফিরে চলে গেলেন।

রোববার বিকেলে মন্মথবাবুর ছেলে তাকে দেখতে আসবে। দুপুর পর্যন্ত বেশ সহজভাবেই ছিলো সে। এই কদিন সে নানা-রকম ভাবে কল্পনা করেছে অচেনা বাড়িতে অচেনা ছেলের সঙ্গে তার ঘরকন্নার ছবি। বিয়ের আগে আর দশটা সাধারণ মেয়ে যেমনি রঙিন ছবি আঁকে মনের পটে, ঠিক তেমনি চেষ্টা করছে, মনের দিক থেকে সাড়া না পেলেও বিষণ্ণ বোধ করেনি মোটেও। সহজভাবে ঘরকন্নার কাজে মাকে সাহায্য করেছে, অবসর সময়ে মাইনে-করা তবলচির সঙ্গে বসে গান করেছে, বাবার জন্যে যে সোয়েটার বুনছিলো সেটি শেষ করেছে। রোববার দিনও মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘরদোর মুছিয়েছে, বসবার ঘরের ফুলদানিগুলোতে ফুল সাজিয়েছে। দুপুরে ঘুমিয়ে, ঘুম থেকে উঠে মায়ের কাছে বসে ময়দা মেখে লুচি বেলে দিয়েছে। কিন্তু যখন দু'চারজন আত্মীয় মহিলা আসতে সুরু করলো, অস্বোয়াস্তিবোধ করতে সুরু করলো তখন থেকে। মনে হোলো যেন কিছুই ভালো লাগছে না, বেশ ছিলো কালকের দিন পর্যন্ত। এসব আবার কী সব ঝামেলা!

মন্মথবাবুদের আসবার সময় হয়ে এলো। গামছা কাঁধে ফেলে চান করতে গেল পাপিয়া। চানের ঘরে ঢুকে হঠাৎ যেন সোয়াস্তি পেলো, বেশ নিরিবিলি মনে হোলো এখানে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললো নিজের মনে। একটুখানি কেঁদে নিয়ে চোখ মুছে গুণ গুণ করে একটি গানের কলি ভাজতে ভাজতে চান করে নিলো।

চান করে যখন বেরিয়ে এলো তখন স্নিগ্ধ সন্ধ্যা নেমেছে কলকাতায়। সারাদিনের গুমোট কেটে গেছে, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। রাস্তা দিয়ে যুঁই আর বেলফুলের মালা নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে এক মালাকর।

খুব স্নিগ্ধ সতেজ দেখাচ্ছিলো সদ্যোস্নাতা পাপিয়াকে। কী

সুন্দর দেখাচ্ছে,—বলাবলি করলো অভ্যাগত মেয়েরা। তাদের দিকে না তাকিয়ে পাপিয়া নিজের ঘরে ঢুকে সাজগোজ করে নিলো মায়ের নির্দেশ মতো।

বাইরে একটা সোরগোল শোনা গেল। মন্মথবাবু এসে গেছেন তাঁর ছেলে আর বাড়ির অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। তাদের আদর অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সবাই।

পাপিয়া চুপচাপ বসে রইলো নিজের ঘরে। বিছানার তলা থেকে একটি সিনেমা-মাসিক বার করে ভেতরের এটি ছবি দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর সেটি আবার রেখে দিলো বালিশের তলায়।

একটু পরে পাপিয়ার ডাক পড়লো। ভেজানো দরজা ঠেলে ওর মা নিজে এলেন পাপিয়াকে নিতে।

পাপিয়া মুখ নিচু করে বসে রইলো।

—চল্। এবার তোকে ওঁদের কাছে গিয়ে বসতে হবে যে।

পাপিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মনোরমা বললেন,—চল লক্ষ্মীটি, সবাই বসে আছেন তোর জন্যে।

আমি যাবো না,—পাপিয়া আস্তে আস্তে বললো।

মনোরমা হেসে ফেললেন,—কী ছেলেমানুষী করছিস। ওঠ।

পাপিয়া হঠাৎ মায়ের কোমর জড়িয়ে বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো,—না মা, আমি যাবো না। ওদের চলে যেতে বলো। আমি বিয়ে করবো না।

মনোরমার চোখে জল এলো। কোন্ মায়ের ইচ্ছে করে মেয়েকে পরের বাড়ি পাঠাতে! তবু হাসিতে মুখ ভরে মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন,—ছেলেমানুষী করে না, চল। তুই এখন বড় হয়েছিস, বি-এ পাশ করেছিস, এরকম কান্নাকাটি করলে লোকে কি বলবে? আয়।

পাপিয়া নিজেকে সামলে নিলো। চোখ মুছে উঠে পড়লো, বাইরের ঘরে এলো মায়ের সঙ্গে। অভ্যাগতদের নিজে পরিবেশন

করে খাওয়ালো, একটি গানও শোনালো, দু-চারজনের প্রশ্নের উত্তর দিলো,—কিন্তু একটিবারও মন্মথবাবুর ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালো না।

সবাই চলে যাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে রইলো।

রাত্তিরেই খবর পাওয়া গেল, মন্মথবাবুর ছেলের পছন্দ হয়েছে পাপিয়াকে।

দীপ্তিকে খবর পাঠিয়ে দিলো পাপিয়া। দীপ্তি আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে ফেললো। কিছু জিজ্ঞেস করলো না দীপ্তি, বোধহয় বুঝতে পারছিলো সে।

পাপিয়া বললো,—আমি এখানে বিয়ে করতে পারবো না।

এরকম ভালো ছেলে কি আর পাওয়া যাবে? ভেবে ছাখ—দীপ্তি বললো।

আমি বিয়ে করবো না,—উত্তর দিলো পাপিয়া।

দীপ্তি রাগে ফুলতে লাগলো। কাজল-দার কি দরকার ছিলো এতটুকু একটি ছেলেমানুষ মেয়েকে নিয়ে ওরকম ছেলেমানুষী করবার,—সে ভাবলো। মুখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো,—ছাখ পাপিয়া। কাজল-দা কি রকম লোক সে তো সবাই জানে। সে মস্ত লোক, কেন তুই তার জন্যে মিছিমিছি এরকম কষ্ট পাবি?

পাপিয়া শুধু উত্তর দিলো,—আমি বিয়ে করবো না।

দীপ্তি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পাপিয়ার মুখে শুধু ওই একটি কথা,—আমি বিয়ে করবো না।

দীপ্তি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো,—আচ্ছা, আমি তোকে কাজল-দার ঠিকানা এনে দিচ্ছি। তুই ওকে একটি চিঠি লেখ।

—না।

—আচ্ছা, আমি লিখি?

—না।

—তাহলে ?

—আমি কিছু জানি না। আমি বিয়ে করবো না।

দীপ্তির এবার রাগ হলো পাপিয়ার উপর। এরকম ছেলেমানুষী কেউ করে নাকি ? জিজ্ঞেস করলো,—এতে কি লাভ, বল ? তোর কি ধারণা কাজল-দা তোকে মনে রেখেছে ?

—তাতে আমার ভারী বয়ে গেল।

ছাখ পাপিয়া,—দীপ্তি বোঝাবার চেষ্টা করলো,—জীবনে এরকম কষ্ট অনেকেই মাঝে মাঝে পায়, তাই বলে কি কেউ এরকম ছেলেমানুষী করে ?

অনেকক্ষণ ওর কথার কোনো উত্তর দিলো না পাপিয়া, তারপর আস্তে আস্তে বললো,—আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

দীপ্তি রাগ করে জিজ্ঞেস করলো,—তাতে তোর কি লাভ ? তুই কি ভেবেছিস কাজল-দা কোনোদিন ফিরে আসবে তোর কাছে, না কি তুই ওকে যে চোখে দেখিস সেটাও জানতে পারবে বা তার কোনো প্রতিদান দেবে ?

পাপিয়া শুধু বললো,—ওসব আমি জানিনা, ভাবিও না। আমি শুধু জানি যে আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

দীপ্তিকে যতো সহজে বলা গেলো, মা-বাবাকে ততো সহজে বলা গেল না। পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসত তাঁদের নেই। পাকা দেখার দিন ঠিক হয়ে গেছে, নানা জিনিসের ফর্দ তৈরী হচ্ছে এখন।

তবু এক সময় পাপিয়া মনোরমাকে বললো,—আমি এখন বিয়ে করবো না।

মনোরমা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখে বুঝলেন যে কিছু একটা হয়েছে। চুপচাপ মেয়ের বক্তব্য শুনলেন। তারপর জানালেন নীহারবাবুকে।

বিয়ে করবে না?—স্তম্ভিত হলেন নীহারবাবু,—কি করবে তাহলে?

আরো পড়াশুনো করবে। চাকরি করবে। যদি বিয়ে করতে হয় তো পরে ভেবে দেখা যাবে, এখন নয়।

মনোরমার কথা শুনে নীহারবাবু হেসে নিলেন খানিকটা। তারপর গম্ভীর হয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। মেয়ের ভালোমন্দ তিনিই বোঝেন ভালো, যা করবার তিনিই করবেন, তিনি যে রকম বাপের কর্তব্য করছেন, মেয়েও যেন তেমনি মা-বাপের কথার অবাধ্য না হয়ে তার কর্তব্য পালন করে,—একথা পরিস্কার বলে দিলেন মনোরমাকে।

পাকা দেখার দিন কাছে এসে গেল।

॥ বারো ॥

দীপ্তির সঙ্গে কাজল মিত্রের তেমন কিছু আলাপ ছিলো না, তাই নিজের প্রচুর ইচ্ছে সত্ত্বেও সে কোনো চিঠি লিখতে পারলো না। সুবিমলকে ধরে পড়লো সে। তাকে প্রায়ই চিঠি লিখতে হোতো, সে যদি পাপিয়ার কথা তাকে একটু লিখে দেয়।

দীপ্তির কথা শুনে সুবিমল আকাশ থেকে পড়লো। মেয়েটার মাথা খারাপ হোলো নাকি ? কাজলকুমার এত বড় একজন ফিল্মস্টার, তার কাছে সে কি করে লিখবে এক সাধারণ মেয়ের কথা ? এরকম সে তো কোনোদিন শোনেনি। পাপিয়ার সঙ্গে তার দু-দিনের আলাপ, সে কেন মনে রাখতে যাবে পাপিয়াকে ? তবু দীপ্তির কথায় নিজের চিঠির অন্যান্য কথার মধ্যে দু-লাইন লিখে দিলো,—পাশের বাড়িতে পাপিয়া মেয়েটিকে তোমার মনে আছে ? সে প্রায়ই বলে তোমার কথা, জানতে চায় তুমি আবার কবে কলকাতায় আসবে।......

কাজল মিত্রের উত্তর এলো। তাতে প্রডাকশান সংক্রান্ত নানা কাজের কথা, নানারকম নির্দেশ পরামর্শ আছে, শুধু পাপিয়ার কোনো উল্লেখ নেই। তাতে সুবিমল একটুও অবাক হোলো না। সে এটাই প্রত্যাশা করেছিলো।

দীপ্তি ভেবেছিলো পাপিয়াকে বলবে না। কিন্তু দেখা হতে না জানিয়ে পারলো না। শুনে পাপিয়া খুব রাগ করলো, কেন তার মানা সত্ত্বেও তার কথা লেখা হয়েছে চিঠিতে। খুব ঝগড়া করলো, দীপ্তির সঙ্গে।

কিন্তু কিছুতেই জানাতে পারলো না যে কাজলের বম্বের ঠিকানা যোগাড় করে সেও চিঠি লিখেছে তাকে। দু-চার লাইনের চিঠি,—আমায় মনে আছে তো ? কেমন আছেন ? আবার কবে কলকাতায় আসছেন।......

সেই চিঠির উত্তরের প্রত্যাশা করে দিন কেটে যাচ্ছে।

আমি আর কিছু চাই না,—পাপিয়া কামনা জানাতো অন্তর্যামীর কাছে,—শুধু তাকে আরেকবার দেখতে চাই।

এসব কথা দীপ্তিকে জানানো গেল না। সময় কেটে গেল, চিঠির কোনো উত্তর এলো না, এগিয়ে এলো পাকা দেখার দিন।

মাকে বললো,—আমার বিয়ে দিয়ো না। তাতে আমিও সুখী হবো না, তোমরাও হবে না।

কিন্তু কেউ তার কথা কানে তুললো না। বিয়ের আগে কতো মেয়ে একথা বলে, চোখের জল ফেলে, কিন্তু কে কার কথা শোনে।

পাকা দেখার দু-দিন আগে পাপিয়া হঠাৎ তার মনস্থির করে ফেললো। সে এত বিচলিত হয়ে উঠেছিলো যে তার ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা ছিলো না। প্রথমে ভেবেছিলো যে দীপ্তিকে বলবে, কিন্তু পরে মনে হোলো যে এ ব্যাপারে দীপ্তি কিছু করতে পারবে না, তাকে জানতে দেওয়াও ঠিক হবে না।

তখন মনে পড়লো শৈলেনের কথা।

সে ছিলো পাপিয়ার মামাদের প্রতিবেশী ছেলেবেলা থেকেই চেনাজানা ছিলো তার সঙ্গে। মামাদের সুবাদে সে মনোরমাকে পিসী ডাকতো। খুব ভালো ছেলে, বি-এস-সি পাশ করবার পর এক বিলিতী ফার্মে সেলস্‌ম্যানের চাকরিতে ঢুকেছে। সে মাঝে মাঝে আসতো পাপিয়াদের বাড়ি। পাপিয়াকে তার বিয়ে করবার খুব ইচ্ছে, অন্তরঙ্গ হতে চাইতো তার সঙ্গে। পাপিয়া বুঝতো না তা নয়, কিন্তু খুব একটা ছেলেমানুষীর মুখোস পরে অবুঝ হওয়ার ভান করতো। তার সঙ্গে বিয়ের কথা সে ভাবতে পারতো না, যদিও এমনি খুব পছন্দ করতো তাকে। মনোরমাও বুঝতেন, কিন্তু তাঁর কল্পনার বাঞ্ছিত ভাবী জামাতার সঙ্গে বিলিতী ফার্মের সেলস্‌ম্যানের কোনো মিল ছিলো না বলে, তিনিও খুব আমল দিতেন না তাকে।

এই শৈলেন-দাকেই এসময়ে হঠাৎ মনে পড়লো পাপিয়ার। মনে পড়লো, তাকে একটু খুশী করবার জন্যে শৈলেন-দার কতো আগ্রহ। তাকে কতো চকোলেট টফি এনে খাইয়েছে। পাপিয়ার মনে হোলো আজ তার জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কোনো উপকার কেউ যদি করতে পারে, সে একমাত্র তার শৈলেন-দা।

পাপিয়া ডেকে পাঠালো শৈলেনকে। কোনো ভণিতা না করে সোজাসুজি বললো,—শৈলেন-দা, আমায় তুমি বোম্বে পৌঁছে দেবে?

—বোম্বে? কার কাছে? কেন?

ও সব প্রশ্ন করো না,—পাপিয়া বললো,—কিছু জানতে চেও না, কাউকে বলতেও যেয়ো না। তুমি ছাড়া আর কাউকে বলতে পারছি না বলেই তোমায় বলছি।

কবে যেতে চাও?—শৈলেন জিজ্ঞেস করলো।

—কাল।

—কাল? পরশু না তোমার পাকা-দেখা?

—তার আগেই চলে যেতে চাই।

শৈলেন কি বুঝলো কে জানে, অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললো,—বেশ। কোথায় কখন তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো বলো।

সারারাত পাপিয়ার ঘুম হোলো না। জীবনের এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর তার বয়েসী মেয়ের পক্ষে মনের উত্তেজনা এড়ানো সম্ভব নয়। জানলার ওপারে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশে দপদপ করে জ্বলছিলো একটি মস্তো বড়ো তারা। সেদিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ ভাবলো, একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই নিশ্চিত জীবনের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে পড়া তার পক্ষে উচিত হবে কিনা। একবার বেরিয়ে পড়লে ফিরে আসা সম্ভব হবে না, মা-বাবার মনে যে কি রকম লাগবে সে তো জানা কথা, আর বম্বে গিয়েও বা কি হবে সে কেউ জানে না।

অনন্য শিল্পী কাজলের কাছে তার মতো একটি সামান্য মেয়ে গিয়ে দাঁড়াবে কী ভরসায়, কিসের দাবীতে ?

যুক্তির বিচারে সে দেখতে পেলো যে এসব তার নিছক পাগলামি। এভাবে জীবনের মুখোমুখি হওয়া যায় না। কিন্তু হৃদয়ের আবেগের কাছে এসব যুক্তি ভেসে গেল। অতো কথা আমি বুঝি না,—সে ভাবলো,—এখানে বিয়ে করতে পারবো না, ওরা আমার কথা শুনবে না, সুতরাং আমায় চলে যেতে হবে ; আর ওর সঙ্গে অন্তত একটিবার দেখা আমি করবোই, সে বম্বেতেই হোক বা যেখানেই হোক।

তারপর ?—কে ভাবে তারপরের কথা ? অতো ভাবলে চলে না। সব কিছুর ওপর তার হৃদয়ের নিষ্ঠা বড়ো। জীবনে তার যতো বিপর্যয় আসুক না কেন, শুধু এই নিষ্ঠার ওপর ভরসা করেই তাকে বাঁচতে হবে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো পাপিয়া। কী অন্ধকার আকাশ,—সে ভাবলো,—ওই ঝলমলো তারাগুলো না থাকলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যেতো না। ভাই আকাশ, আমার জীবনটাও তোমার মতো হোক। যতো অন্ধকার হোক, তাতে যেন তারা ঝলমল করে।

হাওড়া স্টেশনে পাপিয়ার জন্যে শৈলেন অপেক্ষা করছিলো। পাপিয়া এসে দেখলো সে খুব অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। তার জন্যে পাপিয়ার সহানুভূতি হোলো, সত্যিই, মস্তো ঝুঁকি মাথায় নিচ্ছে শৈলেন-দা, শুধু তারই জন্যে! সে তাকে কী দিতে পারবে এর প্রতিদানে ? হঠাৎ সে নিজেকে একটু অপরাধী বোধ করলো, এই প্রথমবার। এ পর্যন্ত সে নিজের কথাই ভেবেছে, শৈলেন-দার কথা ভাবেনি একটি বারও। পাপিয়াকে নিয়ে তো বম্বে পৌঁছে দেবে, কিন্তু সে নিজে দাঁড়াবে কোথায়, কলকাতার চেনা-শোনাদের মধ্যে ফিরবেই বা কি করে ?

পাপিয়া ভাবছিলো তাকে কি বলবে, কিন্তু তার আগে শৈলেনই কথা বললো।

—একটা কথা বলবো ভাবছিলাম, তুমি রাগ করবে না পাপিয়া?

পাপিয়া চোখ তুলে তাকালো শৈলেনের দিকে। কি হোলো তার? পিছু হটতে চাইছে না তো? পাপিয়া এমন কিছু বিচলিত হোলো না। ভাবলো, ও যদি যেতে না চায় তো ভালোই হয়, সে টিকিট নিয়ে একাই চলে যাবে।

—পাপিয়া, তুমি আমায় যেখানে নিয়ে যেতে বলো নিয়ে যাবো। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এটা কি ঠিক হবে? কেন চলে যাচ্ছি আমরা? তুমি ওখানে বিয়ে করতে চাও না, এই তো? তাহলে এক কাজ করো না কেন, তুমি ওঁদের বলে দাও, তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও। যদি তুমি আর আমি একই কথা বলি, আমার মনে হয় না তোমার বাবা তোমায় জোর করবেন। একথা শুনলে মন্মথবাবুও বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে দিতে পারেন। এ বিয়ে তো একবার ভেঙে যাক, তারপর দেখা যাবে।

পাপিয়া একটু অবাক হয়ে তাকালো শৈলেনের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

—না, সে হয় না।

—কেন?

—মিছে কথা বলতে পারবো না।

শৈলেন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো,—আচ্ছা, চলো।

পাপিয়াও কি যেন ভাবছিলো, বললো,—না।

—যাবে না?

—না। ভাবছি, সত্যি, পালিয়ে যাবো কেন? কিসের ভয়ে? আর তোমাকেই বা এসবে জড়াবো কেন?

শৈলেন বলে উঠলো,—আমার জন্যে ভেবো না পাপিয়া।

তোমার জন্যে আমি,—বলে হঠাৎ থেমে গেল নিজের উচ্ছ্বাসে লজ্জা পেয়ে।

পাপিয়া বুঝলো। সহানুভূতি হোলো শৈলেনের জন্যে। আস্তে আস্তে বললো,—আমি জানি শৈলেন-দা, কিন্তু যা হবার নয়, তার জন্যে দুঃখ করে কী লাভ! চলো, ফিরে যাই।

—তুমি বম্বে যাবে না?

—যাবো, তবে আজ নয়।

—একা?

—না, যাবো তো বাবার সঙ্গেই যাবো।

বাবার সঙ্গে?—অবাক হোলো শৈলেন।

হ্যাঁ, বাবার সঙ্গেই যাবো,—পাপিয়া বললো,—লুকিয়ে যাবো না, পালিয়ে যাবো না, যেখানে যাবার সোজাসুজি যাবো। কেন গোপন করবো সবার কাছে? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

শৈলেন যে খানিকটা আঁচ করতে পারেনি, তা নয়, তবু জিজ্ঞেস করলো—তুমি অন্য কাউকে ভালোবাসো পাপিয়া।

হ্যাঁ—খুব সহজভাবে উত্তর দিলো পাপিয়া, উত্তর দিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। এই প্রথম সে খোলাখুলি কারো কাছে স্বীকার করলো যে সে একজনকে ভালোবাসে! তার হাসিও পেলো। স্বীকার করলো কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে নয়, কোনো আপন-জনের কাছে নয়। এমন কি, যাকে সে ভালোবাসে সেও আজও জানে না, প্রথম জানলো শুধু এমন একজন যার মনে একটু ভালোবাসা আছে তার জন্যে, যে তার জন্যে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিতে প্রস্তুত কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই।

কে সে?—শৈলেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো পাপিয়ার কথা শুনে, বললো,—আমি তাকে ধরে নিয়ে আসবো তোমার কাছে।

পাপিয়া হাসলো। উত্তর দিলো,—তোমরা কেউ পারবে না, শৈলেন-দা,—যদি কেউ পারে তো আমিই পারবো।

শৈলেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো,—পাপিয়া, তোমায় আমি খুব ছেলেমানুষ ভাবতাম।

ছেলেমানুষ আমি কোনোদিনই ছিলাম না,—পাপিয়া একটু হেসে উত্তর দিলো,—মনে মনে আমি খুবই গম্ভীর, আমি বড়ো হয়ে গেছি বয়েস হবার আগেই।

বাড়ি ফিরে দেখে দরজায় ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের ভিড়। বড়োমামা শুকনো মুখে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। পাপিয়াকে দেখে বলে উঠলো,—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? তোকে চারদিকে খুঁজে এলাম। শিগগির ওপরে যা।

—কি হয়েছে বড়মামা ?

—নীহারের খুব অসুখ।

পাপিয়া তাড়াতাড়ি ছুটে উপরে চলে গেল।

খুব সুস্থ সবল লোক নীহারবাবু। সামান্য সর্দি কাশি জ্বর ছাড়া অন্য কোনো অসুখ হতে কোনোদিন দেখেনি পাপিয়া। নিজের পশার গড়ে তুলতে চিরকাল অত্যধিক পরিশ্রম করেছেন, এখন সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে উপনীত হতে না হতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন হার্টের অসুখে।

পাপিয়ার বিয়ের কথা চাপা পড়ে গেল। মা-মেয়ে পড়ে রইলো রোগীকে নিয়ে। অসুখের প্রথম দিকে মামার বাড়ি, মাসীর বাড়ি, পিসীর বাড়ির অনেকেই সকালে বিকেলে খোঁজ খবর নিতো। অসুখ যতো পুরনো হয়ে উঠলো আস্তে আস্তে কমতে লাগলো সবার আসা যাওয়া! শেষ পর্যন্ত রইলো শুধু বড়ো মামা আর শৈলেন।

সংসারের একমাত্র আয়ক্ষম মানুষটি শয্যাশায়ী। ভালো রোজগার করলেও জমা টাকা বেশী ছিলো না। কিছুদিন পর টাকার টান পড়লো খুব। একটু একটু করে কমতে লাগলো মনোরমার গয়নাগুলো।

পুরুষমানুষ আর কেউ নেই। শৈলেন না থাকলে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হতো মনোরমা আর পাপিয়াকে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, সব কিছু সেই করতো।

নীহারবাবু একদিন শুধু পাপিয়াকে একলা পেয়ে আস্তে আস্তে বলছিলেন,—তোর একটা ব্যবস্থা করে যেতে পরেলে আমার কোনো ভাবনা থাকতো না।

পাপিয়া বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে উত্তর দিলো,—আমার জন্যে ভাবনা কারো না বাবা। মনে করো আমি তোমার ছেলে।

নীহারবাবু আর কিছু বললেন না।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। মন্মথবাবু মাঝে মাঝে এসে খোঁজ খবর নিতেন। তিনি বিচক্ষণ লোক। কিছুদিনের মধ্যে বুঝে নিলেন যে, তাঁর দাবিদাওয়া মিটিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এদের আর হবে না। বাড়ি মরগেজ করা আছে, এটাও একদিন হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন অন্য জায়গায়। নীহারবাবু সে খবর পেয়ে শুধু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। মনোরমার চোখে জল এলো। পাপিয়া খুশী হোলো, তবে তার মন ভার হয়ে গেল মা-বাবার কষ্ট দেখে।

তিন মাস পর একদিন সংসারের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি দিলেন নীহারবাবু।

তারপর একদিন মনোরমাকে বাড়ি বিক্রি করে দিতে হলো। বড়ো মামার অবস্থা ভালো নয়, তবু তিনি জোর করে বোন আর ভাগ্নীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পাপিয়া মাস্টারি নিলো এক নার্সারি স্কুলে।

একদিক থেকে সে তৃপ্তিই পেলো। স্বাধীনভাবে নিজে রোজগার করবার স্বপ্ন দেখতো চিরকাল। শেষ পর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়ালো।

অন্য বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। শুধু দীপ্তি আসতো মাঝে মাঝে। কখনো কখনো তার স্বামী সুবিমলও আসতো। তবে ওরা কখনো কাজলের কথা তোলেনি তার

কাছে, সেও কোনাদিন কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। ওরা দেখতো শৈলেন নামে একজন প্রতিবেশী ছেলে প্রায়ই আসে পাপিয়ার কাছে। মনোরমাও তাকে ভালোবাসেন খুব। তাঁরই কাছে শোনা যায়, নীহারবাবুর অসুখের সময় শৈলেন তাদের জন্য যতো করেছে, ততো নাকি নিজের ছেলেও করেনা। শৈলেনের সঙ্গে সিনেমায় যেতো পাপিয়া, তার খুব সিনেমার নেশা! বাংলা ছবি, হিন্দি ছবি, একটিও বাদ দেয়না।

ওর সঙ্গে যদি পাপিয়ার বিয়ে হয়ে যায় তো ভালোই হয় —সুবিমল বলতো দীপ্তিকে,—চমৎকার লোক, খুব অমায়িক, চাকরি করে ভালো।

হ্যাঁ, যদি হয়তো ভালোই হয়,—আস্তে আস্তে উত্তর দিলে দীপ্তি।

সুবিমল অতো বুঝতো না, দীপ্তির কথা শুনেই সে খুব খুশী হোতো।

সংসারে কে কার মনের খবর রাখে! সবাই দেখতো পাপিয়া এখনো সেই আগের মতো ছেলেমানুষ, লাফাচ্ছে, আব্দার করছে, দুষ্টুমি করছে মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে। ঘরকন্নার কাজে মামীমাকে সাহায্য করছে, গান গাইছে অবসর সময়, শৈলেন এলে তার সঙ্গে বসে খুব হাসছে, গল্প করছে।

হয়তো তার মনের খবর রাখতো কলকাতার আকাশ। দেখতো, মাঝে মাঝে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে সে, তাকিয়ে আছে শূন্যের দিকে। চোখভরা একটা গভীর বেদনা। তার জীবনের কতো পরিবর্তন হয়ে গেছে গত এক বছরের মধ্যে।

দমকা হাওয়া এসে তার চুল এলোমেলো করে দেয়। পথ দিয়ে চলে যায় রিক্সা, ফেরিওয়ালা, পথিক। চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ যদি মশলা-মুড়ি কি আলুকাবলী-ওয়ালার হাঁক শোনে, একনিমেষের মধ্যে বদলে যায় তার চেহারা। তক্ষুনি আবার সে চিরদিনের ছেলেমানুষ পাপিয়া।

তরতর করে নিচে নেমে আসে আলুকাবালী কি ফুচকা খেতে।

॥ তেরো ॥

মামা যতোই ভালো হোক, মামার বাড়ি সব সময় থাকবার মতন জায়গা নয়। পাপিয়া স্কুল-মাস্টারি করে আর দু-একটি টিউশানি করে যা পেতো, তার থেকে তার নিজের আর মায়ের খোরাকি দিয়ে দিতো মামীমাকে, মামাতো ভাইবোনেদের পড়াতো, বাড়ির রান্নাও করতো একবেলা,—তবু তাদের আশ্রিত বলেই গণ্য করতেন তার মামীমা। ওঁর বাঁকা কথার খোঁচা প্রায়ই সইতে হোতো মনোরমাকে। এসব বাক্যবানের উপলক্ষ ছিলো বিয়ে-থা করে ঘর সংসার করায় পাপিয়ার অনিচ্ছা। মামীমা তাঁর বাপের বাড়ির সম্পর্কিত দু-চার জায়গায় পাপিয়ার বিয়ের কথা তুলেছিলেন। পাপিয়া যে সেসব বাতিল করে দিয়েছিলো এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি।

শৈলেন এলেই বলতেন,—কি খবর বাবা? আগে তো তোমায় ডেকে ডেকে পাওয়া যেতো না, মাসে একবার দুবারের বেশী আসতেই না, আজকাল যে হপ্তায় তিনচারবার করে আসো।

শুনে মনোরমার মুখ রাগে লাল হয়ে যেতো। শৈলেনও খুব অপ্রস্তুত বোধ করতো। হয়তো সে এসব কথার পর আসতোই না, কিন্তু তার একটা টান পড়ে গিয়েছিলো মনোরমা আর পাপিয়ার জন্যে, তাই এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সত্ত্বেও সে আসা বন্ধ করেনি।

গায়ে মাখতো না পাপিয়া। সে খুব সরল মুখ করে বলতো,—শৈলেন-দা কি ইচ্ছে করে আসে? না এলে আমি রাগ করি বলেই আসে। শৈলেন-দা না এলে আমায় সিনেমায় নিয়ে যাবে কে?

পাপিয়ার উত্তর শুনে মামীমার চোখ মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠতো।

একদিন পাপিয়াকে ডেকে বললেন,—শৈলেনের ঘন ঘন এবাড়ি আসা আমি পছন্দ করিনা।

আমি করি,—পাপিয়া উত্তর দিলো।

পাপিয়া এমনি খুব হাসিখুসি, কদাচিত গম্ভীর হয়ে কথা বলতো। যখন বলতো সামনা সামনি ওর কথার উপরে কথা বলতে কেউ সাহস করতো না। মামীমা একটু গলা নামিয়ে বললেন, —আমি যা পছন্দ করি না, আমার বাড়িতে সেসব হবে কেন?

এক মুহূর্তে পাপিয়া আবার সেই ছেলেমানুষটি। আব্দারে গলার উত্তর দিলো,—আমার মামার বাড়িতে আমার যা খুশি আমি করবো। কারো সাহস আছে, আমায় এসে মানা করুক দেখি?

মামার কাছে মাতুলানী নালিশ করতেন মাঝে মাঝে। মামা ভালোমানুষ হলেও একটু শক্ত লোক। আস্তে আস্তে বলতেন,—পাপিয়া ঠিকই বলেছে।

—ওরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকলে পারে।

যদ্দিন আমি বেঁচে আছি তদ্দিন নয়—উত্তর দিতেন পাপিয়ার মামা।

এসব খুঁটিনাটি কথা পাপিয়া গায়ে মাখতো না। কিন্তু মনোরমার অত্যন্ত স্পর্শকাতর মন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের মনকে একটুও খাপ খাওয়াতে পারেন নি। এ সব কথা শুনলে মন অভিমানে ভারী হয়ে উঠতো, পাপিয়াকে কিছু বলা বৃথা, সব কিছু হেসে উড়িয়ে দেয়। তাই একদিন শৈলেনকে ডেকে বললেন, পাপিয়ার সঙ্গে কথা বলে নাও। এভাবে তো চিরকাল চলবে না।

অনেকক্ষণ ভেবে দেখলো শৈলেন। তারও মনে হোলো—সত্যিই তো! এ ভাবে তো চিরকাল চলবে না।

তিন চারদিন পরের কথা। পাপিয়া সন্ধ্যেবেলা বাজার করতে গিয়েছিলো গড়িয়াহাট মার্কেটে ঝি-কে সঙ্গে করে। শৈলেনও সঙ্গে ছিলো। বাজার সারবার পর শৈলেন পাপিয়াকে বললো,—জিনিসগুলো ঝিয়ের হাতে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

—আর আমরা ?

—লেক।

—না লেক নয়। ওখানে অনেক লোক। আমার ভালো লাগে না।

পাপিয়ার কথা শুনে শৈলেন খুশী হোলো। যেখানে অনেক লোক সেখানে পাপিয়া শৈলেনের সঙ্গে একলা বসতে চায় না, একথা খুব আশাসূচক মনে হোলো তার কাছে।

ওরা দুজন হাঁটতে লাগলো গড়িয়াহাট রোড ধরে হিন্দুস্থান রোড, ডোভার লেন, গরচা ফার্স্ট লেন বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে গেল কিছুদূর। পথের ধারে ট্রামডিপোর পাশে একটি ছোটো তিনকোনা পার্ক। বেশ নিরিবিলি, আবছায়া। এখানে সেখানে বেঞ্চিতে বসে গল্প করছে দুজন চারজন। এককোনে একটি বেঞ্চিতে শৈলেন আর পাপিয়া পাশাপাশি বসলো।

দুজনে চুপচাপ বসে রইলো কিছুক্ষণ। পথ বেয়ে মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে দোতলা বাস, গাড়ি, ট্রাম। পথের ওপারে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের নিস্তব্ধ একতলা বাড়িগুলোতে স্নিগ্ধ আলো। শৈলেন তাই দেখলো বসে বসে। পাপিয়া তাকিয়ে দেখছিলো সামনের মসীকৃষ্ণ আকাশখানি। সেখানে অনেক তারা।

শৈলেন আস্তে আস্তে হাত রাখলো পাপিয়ার কাঁধে। পাপিয়া মনে মনে একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। সে ভাব না দেখিয়ে হেসে বললো,—কাঁধে হাত কেন ? আমার ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে।

শৈলেন কাঁধের উপর থেকে হাত নামালো। কিন্তু মন তার অসংযত। সে পাপিয়ার একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিলো।

পাপিয়া হাত ছাড়িয়ে নিলো না। একটু অপেক্ষা করলো, তারপর নিজের থেকেই বললো,—কি বলতে চাইছো, বলো।

—পাপিয়া !

—কি ?

—একটা কথা তোমায় বলবো ভাবছিলাম।

—বলো।

—আমি তোমায় ভালোবাসি পাপিয়া।

পাপিয়া বিনুনি দুলিয়ে বললো, বাচ্চা মেয়ের মতো,—আমায় তো সব্বাই ভালোবাসে।

পাপিয়াকে চিনতে শৈলেনের তখনো বাকী ছিলে', বললো,—এভাবে আর কদ্দিন চলবে।

—কি ভাবে ?

—এই যে, তুমিও বিয়ে করছো না, আমিও বিয়ে করছি না।

পাপিয়া হেসে উঠলো,—তোমায় বিয়ে করতে মানা করছে কে ?

—আমি তো তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।

পাপিয়া বুঝলো যে, এবার তার মুখোসটা খুলতে হবে। গম্ভীর হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে বললো,—শৈলেন-দা!

—কি ?

—তুমি আমাদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। আমাদের দুঃসময়ে তুমি যা করেছো সে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। তোমার মন খুব বড়ো। তাই তোমায় আজ একটা কথা বলছি, তুমি রাগ কোরো না।

—বলো।

—দেখ, একদিন তোমায় একটি কথা বলছিলাম, যা কোনোদিন আর কাউকে বলিনি। কেন সেকথা ভুলে গেলে শৈলেন-দা ? তুমি আমায় ভালোবাসো, এটা মস্তো সম্মান। কিন্তু আমি কি করবো বলো ?

—কেন ?

—তুমি তো জানো, আমি আরেকজনকে ভালোবাসি। সে মন নিয়ে তো অন্য কারো দিকে তাকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শৈলেন একটু চুপ করে রইলো। বললো,—তাহলে আমার কি হবে ?

—তোমার জন্য আমার কষ্ট হয় শৈলেনদা, কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই।

শৈলেন আস্তে আস্তে পাপিয়ার হাত ছেড়ে দিলো। বললো, —আমি ভুল বুঝে তোমার হাত ধরেছিলাম পাপিয়া। আমায় মাপ করো।

পাপিয়া এক নিমেষে আবার সেই ছেলেমানুষটি হয়ে গেল। নিজের থেকে শৈলেনের হাত চেপে ধরে হেসে বললো,—তুমি সারাজীবন আমার হাত ধরে রাখো না, আমি রাগ করবো না। তুমি তো আমার কোনো অসম্মান করোনি।

—আমি তোমাদের বাড়ি আর আসবো না পাপিয়া।

—ওমা, সে কি কথা! আমি সিনেমায় যাবো কার সঙ্গে?

—আমার আর আসা উচিত নয়।

কেন শৈলেনদা? কাউকে ভালোবেসে তার ভালোবাসা না পেলে বুঝি মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতে হয়?

—দেখ, আমি তোমায় ভালোবাসি কিন্তু তুমি আমায় ভালো-বাসো না, তোমার কাছে থেকে সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না। তার চাইতে দূরে থাকাই ভালো।

পাপিয়া আবার তার গম্ভীর ব্যক্তিত্বে ফিরে গেল। বললো, —শৈলেন-দা, তুমি তো ভালোবাসো, তা-হলে আমার মনেও যে আরেকজনের জন্য তেমনি ভালোবাসা আছে, তুমি তার সম্মান দিতে পারছো না কেন?

শৈলেন একথার উত্তর দিলো না। জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা পাপিয়া, তুমি যাকে ভালোবাসো, সে তোমার কাছে আসে না কেন?

আর কতো কাছে আসবে?—পাপিয়া ছেলেমানুষের মতো হেসে বললো,—সে একেবারে আমার অন্তরের মধ্যে বসে আছে।

শৈলেন উত্তর দিলো,—দেখ পাপিয়া, আমি বোকা নই।

এটা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, সে লোকটি তোমায় নিয়ে খুব মাথা ঘামায় না।

মাথা দুলিয়ে পাপিয়া হাসিমুখে বললো,—সে আমায় ভালো করে চেনেই না।

পাপিয়ার কথা শুনে শৈলেন একটু অবাক হলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি তাকে কোনোদিন পাবে বলে আশা করো?

পাপিয়া চোখের পলকে গম্ভীর হয়ে গেল। খুব কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলো,—শৈলেন-দা ওর কথা আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না।

কিছুদিন শৈলেনদার দেখা নেই। একদিন হঠাৎ শোনা গেল সে ট্রান্সফার নিয়ে মাদ্রাজ চলে গেছে। মামীমা একটু আড়চোখে পাপিয়ার দিকে তাকালেন। পাপিয়া শুধু দু-চার মিনিট জানালায় দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর হৈ-হৈ করে লুডো খেলতে বসলো মামাতো ভাই বোনেদের সঙ্গে। মনোরমা একটু বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। শৈলেনকে তিনি নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। এই কদিনে সে মনোরমার অত্যন্ত আপনার জন হয়ে উঠেছিলো। থেকে থেকে তার কথা মনে পড়তেই জল আসছিলো মনোরমার চোখে।

দু-চারদিন কিছুই বললেন না পাপিয়াকে। তারপর একদিন রাত্তিরে শুতে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলেন—শৈলেন কি তোকে কিছু বলেছিলো?

পাপিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে হাই তুলে একটা ম্লান হাসি হেসে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো। তার ঘুম পেয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। অন্ধকার ঘরে শুধু মনোরমা একা জেগে রইলেন।

বাইরে আকাশে ফিকে জ্যোৎস্না। দুটি বেড়াল চিৎকার করছে ওধারের পাঁচিলের উপর বসে। ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালানো শিখছে চৌধুরীদের ছোকরা চাকর বনমালী। সামনের বাড়ির ছাতের চিলেকোঠায় বসে সেতারের রেওয়াজ করছে

চৌধুরীদের মেজো ছেলে। মনোরমার চোখে ঘুম এলো না। পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো বার বার।—ঠিক এ সময় নীহারবাবু নিচের অফিস ঘরে বসে ব্রীফ তৈরী করতেন। চারদিক ঘুমে নিস্তব্ধ হয়ে যেতো, তবু তাঁর হুঁশ নেই। নিজের ঘরে পাপিয়ার চোখে তখন অঘোর ঘুম, ঘুমের মধ্যে কথা বলে উঠতো মাঝে মাঝে। মনোরমারও ঘুম পেতো, তবু জেগে বসে থাকতেন নীহারবাবুর অপেক্ষায়। উনি এলে মশারী খাটিয়ে তবে শুতে যেতেন।

জীবনের একটা বাঁধা ছক ছিলো সে সময়। বেশী কিছু আশা ছিলো না, তাই বেশী ভাবনাও ছিলো না। মেয়ের বিয়ে দেবেন, নিজেদের যা কিছু সঞ্চয় থেকে শেষজীবন মোটামুটি কাটিয়ে দেওয়া যাবে, এর বেশী প্রত্যাশা কিছু ছিলো না। মেয়ে চাকরি করবে, বিয়ে করবে না, নিজেকে থাকতে হবে ভায়ের বাড়িতে,—এসব কোনোদিন ভাবাও যেতো না।

এত আদরের মেয়ে পাপিয়া, তাকেও চাকরি করতে হচ্ছে!—ভাবতে ভাবতে মনোরমার চোখে জল এলো। কর্ত্তাকে সে একদিন বলেছিলো,—আমার জন্যে ভেবো না বাবা, মনে করো আমি তোমার ছেলে।—পাপিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর কি হবে, এ ভাবনাও ছিলো। তাই সব ছেলে তাঁর পছন্দও হোতো না। তাদের সঙ্গে গিয়ে তো থাকা যাবে না। কিন্তু শৈলেনকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিলো। সে তাঁকে নিজের মায়ের মতো মানতো, তার মা-বাবা নেই, ভাই নেই, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, তার সঙ্গে গিয়ে থাকা যেতো। ভাবতে ভাবতে পাপিয়ার উপর রাগ হোলো মনোরমার। এখানে ভায়ের বাড়িতে এভাবে কদ্দিন থাকা যায়।

কেন বোঝে না বোকা মেয়েটা! কিছু বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। স্কুলে চাকরি করে, এই সংসারের এত কাজ করেও কি করে এত হাসিখুশি থাকতে পারে মেয়েটি, কিসের আশায়,—ঠিক বুঝতে পারতেন না মনোরমা। এটুকু বুঝতেন যে সে বুকে কোনো একটা ব্যথা চেপে রেখেছে, কিন্তু কিসের ব্যথা সেকথা তিনি আঁচ

করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিলো, এই যে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেল তাঁদের সংসারে, তারই ব্যথা। অভিমানী মেয়ে, প্রকাশ করতে চায় না, হেসে হৈ-হুল্লোড় করে ভুলে থাকতে চায়!

মনোরমার যখন ঘুম পেলো, তখন চারদিক নিঝুম। শুধু পূবের হাওয়া খুব অশান্ত হয়ে উঠেছে।

দীপ্তি একদিন জিজ্ঞেস করলো,—তুই কিসের আশায় বসে আছিস বলতো?

কবে বুড়ো হবো তারই আশায়—হেসে উত্তর দিলো পাপিয়া—এরকম ছেলেমানুষ থাকতে আর ভালো লাগে না। সব্বাই বকে, এমন কি তুইও।

দীপ্তি রাগ করলো,—ফিল্মস্টারকে নিয়ে অনেকে অনেক রকম পাগলামি করে,—বললো সে,—কিন্তু এরকম দেখিনি। লোকে শুনলে হাসবে যে।

পাপিয়া গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো,—আমি কোনো ফিল্মস্টারকে চিনি না, ওদের নিয়ে আমি মাথাও ঘামাইনে।

দীপ্তি অবাক হয়ে পাপিয়ার দিকে তাকালো।

পাপিয়া হেসে ফেললো,—তোর কাজল-দা আমার কাছে কাজল-দাই, তার বেশী কিছু নয়,—বললো সে।

দীপ্তি গালে হাত দিলো।

—আচ্ছা ভাই পাপিয়া, এরকম হয়? শুধু একদিন কি দু'দিনের দেখা, ব্যস তারপর আর অন্য কারো দিকে চোখ তুলেও তাকালি না?

—হোলো তো।

তুই সত্যি সত্যি আর বিয়ে করবি না?—দীপ্তি জিজ্ঞেস করলো।

কারো সঙ্গে ঘর করতে আর পারবো না,—খুব সহজ গলায় উত্তর দিলো দীপ্তি।

—তুই মনে মনে ওকে ভালোবাস, কিন্তু একটা বিয়ে কর!

—সে হয়না দীপ্তি।

দীপ্তি চটে গেল।—আচ্ছা ভালোবাসা তোর! যাকে ভালো-বাসলি সে কোনোদিন জানলো না. জানবেও না, জানলে আসবেও না বরং হেসে খুন হবে, আর তার জন্যে তুই বিয়ে না করে বসে থাকবি?

পাপিয়ার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। গম্ভীর গলায় বললো,—আমি কারো জন্যে বসে নেই। তার জন্যে যে আমি বিয়ে করছি না তাও নয়। আমি বিয়ে করছি না আমারই জন্যে। যে কাজ আমার ভালো লাগে না সে আমি করিনে।

—মাসীমা তো মনে কষ্ট পাবেন।

—দু-চার পাঁচ দিন পাবেন, তারপর সয়ে যাবে।

—কাজল-দা কি তোর ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারবে? ও কি রকম লোক তুই শুনিস নি?

পাপিয়া উত্তর দিলো,—আমি তো প্রতিদান চাইনি, চাইবোও না।

—তুই কি চাস?

পাপিয়া হাসলো বাচ্চা মেয়ের মতো। বললো,—কিচ্ছু না, শুধু আরেকবার দেখতে চাই।

দীপ্তি চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো,—এরকম শুনি নি। একটু ভালোবেসে ব্যথা পায়নি, এরকম মেয়ে অনেক আছে। তাই বলে কি কেউ ঘর সংসার করে না? যাকে চাওয়া যায় তাকে সব সময় পাওয়া যায় নাকি?

পাপিয়া একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

আমি যখন ফাস্ট ইয়ারে পড়তাম,—দীপ্তি বলে গেল,—আমাদের পাশের বাড়ি একটি ছেলে থাকতো। পড়তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। লুকিয়ে ছাতের কোনে বসে কতো সময় কাটিয়েছি তার হাতে হাত রেখে। সে যখন বিয়ে করে বিলেত চলে গেল কী কেঁদেছি তার জন্যে! তাই বলে কি আমি সুবিমলকে ভালোবাসিনি, না ওকে বিয়ে করিনি?

পাপিয়া হাসতে হাসতে বললো,—আমায় একটি পুরুষ মানুষ দেখিয়ে দে, আমি তাকে ভালোও বাসবো, বিয়েও করবো।

সংসারে পুরুষমানুষের অভাব?—দীপ্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আমার চোখে শুধু একজনই আছে,—উত্তর দিলো পাপিয়া।

দীপ্তি হাঁ করে তাকিয়ে রইলো পাপিয়ার দিকে। তারপর বললো,—তোর মাথা খারাপ। যা অসম্ভব, যা হয় না, তাই নিয়ে তোর মনগড়া কষ্ট।

—কষ্ট হবে কেন? আমার কোনো কষ্ট নেই। আমি তো কিছু চাই না, শুধু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে চাই। মা যদ্দিন আছেন তদ্দিন ওঁর দেখাশোনা করতে চাই। ওঁর ছেলে নেই বলে মনে যেন কোনো আক্ষেপ না থাকে।

—তারপর? যেদিন উনি থাকবেন না?

তদ্দিনে তো বুড়ো হয়ে যাবো,—পাপিয়া হেসে উত্তর দিলো।

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস্ কেন? দীপ্তি ক্ষেপে গেল।

শুধু সন্তানের মা হওয়ার জন্যে নয়।

দীপ্তি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো,—ত্যাখ পাপিয়া, ভালোবাসা-টালোবাসা ওসব কিছু নয়, শুধু দু-দিনের নেশা। বিয়ের পর সব সমান।

পাপিয়া হেসে ফেললো।—তোর বিয়ে হয়েছে দু-দিন হয়নি, এর মধ্যে তোর মুখে এসব কথা?

—শুধু আমার মুখে কেন? অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করে ত্যাখ, রমলা, শ্যামলী, সুনীতা, ওদের গিয়ে জিজ্ঞেস কর, সবাই ওই একই কথা বলবে। সকালবেলা রান্নার পাট, দিনের বেলা চাকরি, রাত্তিরে আবার রান্না, মাসের শেষে টাকার টান, কে মাথা ঘামায় প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে?

মাথা কেউ ঘামায় না,—পাপিয়া আস্তে আস্তে উত্তর দিলো,—কিন্তু মনের ভিতর সবাই পোষে। তা নইলে বাঁচে কি নিয়ে?

তুই যা বলছিস সে তো রাগের কথা। সত্যি সত্যি বুকে হাত দিয়ে বলতো!

একথার উত্তর দীপ্তি দিলো না। একটু চুপ করে থেকে বললো,—পাপিয়া এই এক বছরে তুই অনেক বদলে গেছিস।

শুধু দীপ্তিকেই বলেছিলো পাপিয়া, আর কাউকে বলেনি। তাই কেউ বুঝতেও পারতো না। তার উপরকার হাসিখুশি ভাব দেখে সবাই ধরে নিতো, তার ছেলেমানুষী ভাবটা এখনো কাটেনি।

পাপিয়ার এক সম্পর্কের মাসতুতো বোন ছিলো মঞ্জুশ্রী। তার বিয়ে হয়েছিলো অবস্থাপন্ন ঘরে। মনোরমা একদিন দুঃখ করছিলো তার কাছে। সে বললে,—ও কিছু নয় মাসিমা, এক একটি মেয়ের মনে ওরকম একটু দেমাক থাকে। আমি দেখছি কি করা যায়।

সে পাপিয়াকে একদিন নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

মঞ্জুশ্রী বিয়ে করেছিলো একটা অসামাজিক বেকায়দায় পড়ে। এখন ঘর-সংসার করছে আর দশজনার মতো, তাই সেকথা কেউ আর মনে রাখেনি। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভালো বলে সে সামাজিক মার্জনা পেয়েছিলো আত্মীয় মহলে। কিন্তু তার একটা মনস্তাত্বিক বিকলন ছিলো, চেনা-শোনাদের মধ্যে এ মেয়ের সঙ্গে সে ছেলেকে জড়িয়ে দিয়ে, তাদের জীবনে সংযমহারা পরিবেশ সৃষ্টি করে, সে আনন্দ পেতো। এ খবর বয়োজ্যেষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়-আত্মীয়ারা রাখতেন না, বরং এভাবে কয়েকজনের বিয়ের ফুল বিকশিত করানো হয়েছিলো বলে কেউ কেউ মাঝে মাঝে সরল মনে তার শরণাপন্ন হোতো।

মঞ্জুশ্রীর একটা থিওরী ছিলো,—সংসারে অনেক সংযত মেয়ে ততক্ষণই সংযত, যতক্ষণ অসংযত হবার সুযোগ না পায়। ভয় তাদের শুধু লোক লজ্জার। সুতরাং তাদের নিরিবিলি হবার সুযোগ দাও, প্রকৃতি দেবী তার নিজের পথ খুঁজে নেবে।

এত কথা মনোরমা জানতেন না, পাপিয়াও ভাবতে পারেনি। মঞ্জুশ্রীর বাড়িতে এসে তার আলাপ হোলো নরেন বোসের সঙ্গে। ছিমছাম স্মার্ট ছেলে, চাকরি করে এক সওদাগরী ফার্মে। দু-তিনটে ভালো স্যুট আছে, একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়িও আছে। পাপিয়া প্রথম দিকটা অতো খেয়াল করেনি, বেশ সহজ ভাবেই মিশেছিলো তার সঙ্গে। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে লক্ষ্য করলো যে, সে যখন এসে পাপিয়ার কাছে বসে, মঞ্জুশ্রী তখন উঠে চলে যায়, তাদের ঘরের মধ্যে একলা রেখে। বাড়ি ফেরার সময় নরেন বোসকে বলে তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। পাপিয়া মনে মনে হাসলো, বিচলিত হোলো না একটুও।

একদিন মঞ্জুশ্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিলো না, পাপিয়া শোয়ার ঘরে বসে গল্প করছিলো তার সঙ্গে। এমন সময় নরেন বোস এসে উপস্থিত হোলো। তার চোখ মুখ দেখে পাপিয়া বুঝলো সে আগের থেকে খবর পেয়েই এসেছে। সে যেভাবে মঞ্জুশ্রীর শোয়ার ঘরে এসে উপস্থিত হোলো তাতে মনে মনে একটু বিস্মিত হোলো পাপিয়া।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জুশ্রী তাদের একলা রেখে চা করে আনবার ছুতোয় উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে গেলো। নরেন বোস খাটের উপর পাপিয়ার পাশে এসে বসলো। রাগে পাপিয়ার মুখ লাল হয়ে গেলো, কিন্তু জীবনের হাস্যরসাত্মক দিকটা দেখাই তার ধাত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে মুখ টিপে হাসলো। রাঙা মুখে সে হাসি দেখে বিমুগ্ধ হোলো নরেন বোস, উৎফুল্ল হোলো সহজ বিজয়ের সম্ভাবনা কল্পনা করে। পাপিয়ার লঘু ছেলেমানুষ দিকটা তাকে কামনাকাতর করছিলো কয়েকদিন থেকে। সে সাহস করে পাপিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে ডান হাতে।

পাপিয়ার ইচ্ছে হোলো তার গালে একটা চড় কষে দেয়, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে তার সরল ছেলেমানুষী হাসিটা

হাসলো। তারপর হঠাৎ দাঁড়ালো, বললো,—আপনি একটু বসুন আমি এক্ষুনি আসছি।

—কোথায় যাচ্ছো?

—রান্নাঘরে। এক্ষুনি আসছি।

—আসছো তো?

—এক্ষুনি। আপান চলে যাবেন না যেন। চলে গেলে খুব রাগ করবো বলে দিচ্ছি।

গলে গেলো নরেন বোস। বললো,—না, না, আমি কোথাও যাবো না। তাড়াতাড়ি এসো।

সেই যে বেরিয়ে গেল পাপিয়া, তারপর আর দেখা নেই।

বাড়ির নেপালী চাকরটা এ সময় বাইরের বারান্দায় ঘুমোয়। সে ঘুম-জড়ানো চোখে এসে একটা কাগজ দিলো নরেন বোসকে।

চায়ের ট্রে নিয়ে মঞ্জুশ্রী ঘরে ঢুকে দেখে সে একা বসে আছে। হাতে তার একটি কাগজ। রাগে ফুলছে সে।

—পাপিয়া কোথায়?

কোনো উত্তর না দিয়ে নরেন বোস কাগজটি এগিয়ে দিলো। মঞ্জুশ্রী দেখে সেখানে মস্তো বড়ো করে একটি কাঁচকলা আঁকা।

—এর মানে?

—পাপিয়ার কাণ্ড। ছেলেমানুষী আর কাকে বলে?

—কোথায় সে?

শুনলো, পাপিয়া চলে গেছে। যাওয়ার আগে কাগজটি দিয়ে গেছে—নেপালী চাকরটিকে, নরেনবাবুকে দেওয়ার জন্যে।

সেদিন মঞ্জুশ্রীর বরাত ছিলো খারাপ। তার স্বামী কি একটা দরকারে সেই দুপুরবেলা হঠাৎ বাড়ি ফিরে এলো। নিজের শয়নকক্ষে হঠাৎ নরেন বোস আর মঞ্জুশ্রীকে দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন।

প্রতিবেশীরা বলে স্বামী-স্ত্রীর কলহ মিটতে নাকি প্রায় মাস-খানেক লেগেছিলো।

পাপিয়া বাড়ি ফিরে এসে মনোরমাকে প্রথমটা কিছু বলেনি। মনোরমা মঞ্জুশ্রীর মুখে নরেন বোসের প্রশংসা শুনেছিলেন। কি জানি কেন, কি মনে করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,—মঞ্জুর ওখানে নরেন বোস বলে যে ছেলেটি আসে, ওর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে?

পাপিয়া গম্ভীর শান্ত চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর গম্ভীর গলায় বললো,—আজ দুপুরে সেও ছিলো।

মনোরমা উৎসুক দৃষ্টিতে পাপিয়ার দিকে তাকালেন।

শান্ত কণ্ঠে পাপিয়া বলে গেলো,—মঞ্জুদি আমাদের ওর শোয়ার ঘরে বসিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মনোরমা এবার উৎকণ্ঠা বোধ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—ও মা, সে কি? তুই কি করলি? বসে রইলি ওখানে?

আমি নরেন বোসকে কাঁচকলা দেখিয়ে চলে এসেছি,—বললো পাপিয়া হঠাৎ ছেলেমানুষী মুখ করে।

মনোরমার মুখ কালো হয়ে গেল। অপরাধী বোধ করলেন তিনি। তিনিই তো মঞ্জুশ্রীর ওখানে যেতে বলেছিলেন পাপিয়াকে। মুখ নিচু করে বসে রইলেন।

পাপিয়া একটা সেলাই করছিলো। হঠাৎ খুব গম্ভীর গলায় ডাকলো,—মা!

মনোরমা মুখ তুলে তাকালেন।

মঞ্জু খুব বাজে মেয়ে। আমার জন্যে ওকে তুমি বলতে গেলে কি বলে? আর যদি কোনোদিন এরকম ছেলেমানুষী করো আমায় নিয়ে, আমি চাকরি নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাবো বলে দিচ্ছি। তোমায় মাসে মাসে টাকা পাঠাবো। ব্যস এছাড়া আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ইদানিং মনোরমার আর ভালো লাগছিলো না। মেয়ের বিয়ে হওয়ার আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। মনে হোতো, মেয়ে

যদি নিজের থেকে কোনোদিন করে তো করবে, অভিভাবকদের চেষ্টা চরিত্রে কিছু হবে না। তাঁর মন প্রাচীনপন্থী হলেও অবস্থার চাপে পরে এই পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বাড়ির আর কারো এটা ভালো লাগলো না। পাপিয়ার বড়ো মামার মতো শান্ত লোকও অসন্তুষ্ট হলেন। ওর বড়ো মাসীমার কথাও মনোরমাকে শুনতে হোতো প্রায়ই। অন্য আত্মীয় স্বজন যারা আসতো তারাও দু-চার কথা বলতে ছাড়তেন না। এ বাড়ি মনোরমার কাছে আস্তে আস্তে অসহ্য হয়ে উঠলো।

একদিন পাপিয়াকে বললো,—যদি মফঃস্বলে কোনো স্কুলে চাকরি যোগাড় করে নিতে পারিস তো ভালো হয়। আমার আর কলকাতায় ভালো লাগছে না।

আমি কলকাতা ছেড়ে নড়বো না,—পাপিয়া শান্তকণ্ঠে বললো।

—কেন?

পাপিয়া হাসলো ছোট্টো মেয়ের মতো,—মফঃস্বলে ট্রাম নেই, বাস নেই, ভালো সিনেমা হল নেই, ওখানে কে যাবে!

মনোরমা বুঝলেন, পাপিয়ার এসব বাজে ওজর। আসল কারণ, সে যাই হোক, ব্যক্ত করতে চায় না। বললেন,—মফঃস্বলে না যাস তো অন্য কোনো বাড়িতে চল। এখানে আমি থাকতে পারছি না।

পাপিয়া গম্ভীর হয়ে একটু ভাবলো। তারপর বললো,—আচ্ছা দেখি।

পাপিয়া যে নার্সারী স্কুলে পড়াতো, তার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি হাইস্কুল করেছিলো। সেখানে চাকরি পেলে মাইনে আরো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বেশী পাওয়া যাবে। তাই পাপিয়া স্কুলের সেক্রেটারি রামবাবুকে ধরে পড়লো।

মুশকিল হচ্ছে কি জানো,—রামবাবু বললো,—তোমার তো ট্রেনিং নেই।

কিছুদিন পরে আমি বি-টি হয়ে নেবো,—উত্তর দিলো পাপিয়া।

রামবাবু তিন-চারদিন ঘোরালো পাপিয়াকে, তারপর বললো,—আচ্ছা, পরশু সন্ধ্যেবেলা একটি এপ্লিকেশান নিয়ে এসো।

সেদিন সন্ধ্যায় তিন-চারজন লোক এসেছিলো রামবাবুর কাছে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেলো। পাপিয়াকে বসে থাকতে হোলো ততক্ষণ। পরে রামবাবু বললো,—চলো তোমায় গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি।

রামবাবু প্রৌঢ় সৌম্য লোক, পাপিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে গাড়িতে উঠে বসলো। ড্রাইভার আছে, কিন্তু সেদিন রামবাবু ড্রাইভারকে নিলো না, নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ পাপিয়া দেখলো গাড়ি তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে না। অন্য একটা নির্জন পথ ধরেছে। সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

রামবাবু লক্ষ্য করলো তার অসোয়াস্তি। হেসে বললো,—চলো, একটু হাওয়া খেয়ে যাই। যা গরম পড়েছে আজ!

পাপিয়া কি বলবে ভেবে পেলো না। আর যাই হোক, লোকটার হাতে তার চাকরি। ভদ্রভাবে যতক্ষণ চুপ করে থাকা যায় ততক্ষণ কিছু না বলাই ভালো। নেহাত নিরুপায় না হলে কড়া কথা বলা ঠিক হবে না।

নতুন টাঁকশালের ওদিকটায় তখন সবে বড়ো রাস্তা তৈরী হচ্ছে। নিরিবিলি, অন্ধকার। সেখানে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালো রামবাবু। বললো,—এ জায়গাটা বেশ। আমার খুব ভালো লাগে।

পাপিয়া তখনো চুপ করে রইলো।

রামবাবু পাপিয়ার হাত ধরলো। একটু চুপ করে থেকে পাপিয়া বললো,—এবার বাড়ি চলুন।

এত শান্ত, এত গভীর গলায় বললো যে রামবাবু অপ্রতিভ হলেন। জোর করে হেসে বললেন,—ভয় পাচ্ছো কেন পাপিয়া, এই দুনিয়ায় আমরা সবাই দুদিনের জন্যে এসেছি…।

বলতে বলতে পাপিয়ার গলা জড়িয়ে ধরলো। পাপিয়া কোনো-রকম চাঞ্চল্য দেখালো না, বাধাও দিলো না। তেমনি শান্ত, গম্ভীর ভাবে বললো,—আমার উপর জবরদস্তি করবার আগে একটা কথা ভেবে দেখুন। বাড়ি ফেরবার পথে আমি যখন থানায় রিপোর্ট করবো তখন কি হবে ?

রামবাবু আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিলো। চুপ করে রইলো একটুখানি। বুঝতে পারলো যে এ মেয়ে উপর উপর দেখতে খুব ছেলেমানুষ হলে কি হবে, খুব সোজা মেয়ে নয়।

আর কিছু না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

রাত্তিরের অন্ধকারে সেদিন বালিশে মুখ গুঁজে পাপিয়া নিঃশব্দে কাঁদলো খুব। ভাবলো,—তুনিয়া যদি এমন হয়, আমি একা যুঝবো কদিন ? বাঁচবো কিসের জোরে ?

রামবাবু স্কুল কমিটির সর্বেসর্বা। তাঁকে বিরূপ করে চাকরি করা যাবে না। পাপিয়া ভাবলো, অন্য কোথাও তাড়াতাড়ি একটা কাজ খুঁজে নিয়ে এই স্কুল ছাড়তে হবে।

কিন্তু তাকে সে সুযোগ রামবাবু দিলো না। তার চাকরি তখনো পুরো হয়নি। সাতদিনের নোটিস দিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হোলো।

পাপিয়ার চাকরি গেছে শুনে মনোরমার মুখের যা চেহারা হোলো, সে রকম বোধ হয় নীহারবাবু মারা যাবার সময়ও হয়নি। উল্লসিত হলেন পাপিয়ার মামীমা।

একটি চাকরি গেলে চট করে আরেকটি পাওয়া যায় না। কেটে গেল আরো কিছুদিন, দেড় মাস কি তু-মাস এ রকম হবে। মামার বাড়িতে পাপিয়া আর মনোরমার অবস্থা আরো তুর্বিসহ হয়ে উঠলো।

কলকাতার বাইরে চাকরি একটা তুটো পাওয়া গেল। কিন্তু পাপিয়া কিছুতেই কলকাতা ছাড়বে না। সবার কাছ থেকে কথা শুনতে হোলো তার জন্যে, মায়ের চোখের জল দেখতে হোলো।

শেষ-পর্যন্ত আর পারলো না। চুঁচড়োয় একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে নিলো। ভাবলো, যাই হোক কলকাতা থেকে খুব দূরে তো নয়।

নিজেদের জিনিসপত্র বাঁধছাঁদা হোলো। যে দিন যাওয়ার কথা সেদিন শুক্রবার। সকালবেলা খবরের কাগজের সিনেমার পাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল পাপিয়া। চুপ করে বসে রইলো। তারপর মনোরমাকে গিয়ে বললো,—আমরা চুঁচড়ো যাচ্ছি না।

আকাশ থেকে পড়লেন মনোরমা।—সে কি কথা? কেন রে?

—আমি এখন কলকাতার বাইরে যেতে পারবো না।

—চাকরিটা নিবি না?

—জানিনা। ওদের জানিয়ে দেবো যে, এখন পারছি না, অন্তত দশ পনেরো দিনের আগে নয়। তারপরে ওরা চাকরিটা আমার জন্যে রাখতে চায় রাখবে, অন্য কাউকে দিয়ে দিতে চায় দিয়ে দেবে।

এই কদিন ধরে একটু সোয়াস্তির স্বপ্ন দেখছিলেন মনোরমা। মেয়ের কথা শুনে হতাশায় তাঁর চোখে জল এলো। ভাবলেন,—এই বয়েসে যে কপালে কত দুঃখ ছিলো! মেয়েটার একটুও মতি-স্থিরতা সেই?

॥ চোদ্দো ॥

বোম্বের চিত্রতারকা কাজলকুমার কলকাতায় এসেছে।—এ খবরটাই পাপিয়া পড়েছিলো সংবাদপত্রের সিনেমা-পাতায়।

একটি বিখ্যাত সিনেমা হলে কাজলকুমারের অভিনীত এক হিন্দি ছবির প্রিমিয়ের। সেখানে দর্শকদের সামনে কিছুক্ষণ সশরীরে উপস্থিত থাকবার জন্যে তাকে কলকাতায় আমন্ত্রণ করে এনেছে ছবির প্রযোজক এবং পরিবেশক।

ভিড় জমে গেল সিনেমা হলের সামনে। জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পুলিশ হাঁফিয়ে উঠলো। এত খাতির কোনো অভ্যাগত বিদেশী রাজপুত্রকেও কেউ করেনা।

ঝকঝকে আধুনিক রথে চেপে এলো কাজলকুমার। অচল হয়ে গেল পথের যানবাহন। কয়েকটি সিনেমাপত্রের ফটোগ্রাফার তার ছবি তুলে নিলো কয়েকটা। দু-তিনটি সিনেমা সাপ্তাহিকের সংবাদদাতা তার সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নিলো। সিনেমা-জগতের হোমরা-চোমরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত। তাদের কারো সঙ্গে করমর্দন করে, কারো সঙ্গে দুটো কথা বলে তাড়াতাড়ি সে হলের ভিতর চলে গেল।

শো ভাঙবার পর জনতা যেন আরো বেড়ে গেল। অনুরক্তদের ভিড় ঠেলে, অটোগ্রাফ বিতরণ করে, এর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে, চারদিকে তাকিয়ে একটু মাথা নেড়ে, সম্মুখে প্রসারিত হাতগুলো এলোমেলো ধরে করমর্দন করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতেই, একটি হাত তার দিকে একটি অটোগ্রাফ খাতা বাড়িয়ে দিলো।

আঃ, এখানেও শান্তি নেই!

খাতাটা নিয়ে কলম বার করে সই করতে গিয়ে দেখে,—আরে!

সে পাতায় তার সই তো আছেই, আর সইয়ের উপরে আছে চার লাইন কবিতা, তার নিজের হাতের লেখা।

কবিতা!—সে আবার কবিতা লিখলো কবে?

পড়লো,—পাপিয়া, তোমার রঙিন খাতায় আমি সামান্য সই, তার বেশী কিছু নই,...

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালো।—আরে? তুমি! এসো, এসো। গাড়ির ভিতর উঠে এসো।

গাড়ি চলতে স্বরু করতে পাপিয়া বললো,—যাক তবু চিনতে পারলেন।

—কেন চিনতে পারব না?

—চার পাঁচ মাস আগে একবার কলকাতায় শুটিং করতে এসেছিলেন। আমি স্টুডিওতে আপনার শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। আপনি আমায় দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু চিনতে পারেন নি।

একথা পাপিয়া কোনোদিন কাউকে বলেনি, দীপ্তিকেও না। কাজল কলকাতায় এসেছিলো হঠাৎ, শুধু দু-দিনের জন্যে। যারা ছবি করছিলো, ওরা ছাড়া আর কেউ জানতো না, সিনেমা-মহলও নয়। দীপ্তিও জেনেছিলো সে কলকাতায় এসে উপস্থিত হবার পর। তার পরদিনই চলে যায়, তাই সে পাপিয়াকেও কিছু জানায় নি। পাপিয়া স্টুডিওতে গিয়ে পড়েছিলো খুব আকস্মিক ভাবে।

পাপিয়ার এক সহকর্মিনী ছিলো অজিতা। তার ভাই এক বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের প্রধান সহকারী। সে এসে একদিন পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করলো,—শুটিং দেখতে যাবে? কাল দাদার বইয়ের শুটিং আছে, যাবে তো চলো।

পাপিয়ার শুটিং দেখবার ইচ্ছে ছিলো অনেকদিন থেকেই, কিন্তু তেমন কোনো স্থুযোগ ছিলো না বলে মনের ইচ্ছে মনেই পুষে রেখে-ছিলো। অজিতা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল আগ্রহের সঙ্গে।

স্টুডিওতে গিয়ে দেখলো সবার মধ্যে একটা উত্তেজনা। প্রোডাকশানের কর্মীরা ছাড়া আরো অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। স্টুডিওর বাইরেও বেশ ভিড়।

শুনতে পেলো,—বম্বে থেকে কাজলকুমার এসেছে শুটিং করতে।

পাপিয়ার হৃদ্‌পিণ্ড যেন হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। একবার ভাবলো, চলে যাই। কিন্তু যাকে শুধু একটিবার দেখবার প্রত্যাশায় এতদিন ধরে একটা চাপা ব্যাকুলতা জমাট বেঁধে আছে তার মনের ভিতর, আজ হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে স্টুডিওর দরজা থেকেই বাড়ি চলে যেতে তার মন সরলো না। উপর উপর সে খুব হাল্কা হওয়ার চেষ্টা করলো জোর করে। নিজেকে বোঝালো,—নাঃ, চলে যাবো কেন! সে শুটিং করতে আসছে, তার শুটিং সে করুক। আমি শুটিং দেখতে এসেছি, চুপচাপ দেখে চুপচাপ চলে যাবো।

কিন্তু কাজল যদি তাকে দেখতে পায়! হঠাৎ এটাই যেন পাপিয়ার ভাবনা হয়ে দাঁড়ালো। কাজলকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে যে সবারই চোখ পড়বে তার উপর!

একটু আড়ালে থাকলেই চলবে,—পাপিয়া ভাবলো। এত লোকজনের মধ্যে কি তার উপর চোখ পড়বে কাজলকুমারের মতো খ্যাতিমানের! সে যেন তাকে দেখতে না পায়,—মনে মনে কামনা করলো পাপিয়া। তারপর সন্ধ্যেবেলা কি কাল সকালবেলা তার বাড়ি গিয়ে তাকে অবাক করে দেবো।

মেক-আপ্ করে কাজল সেট্-এ এলো। সিনেমাপত্রের ফোটো-গ্রাফারেরা বিভিন্ন কোণ থেকে তার কয়েকটা ছবি তুলে নিলো।

শুটিং সুরু হোলো।

এক কোণে অজিতার পাশে বসে চুপচাপ শুটিং দেখলো পাপিয়া। অজিতার খুব উৎসাহ,—কিন্তু পাপিয়া নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে রইলো। শুটিং এমনিতেই অত্যন্ত একঘেয়ে ব্যাপার, তার উপর শুটিং-এ ওর একেবারে মন ছিলো না। তার মনের ভিতর সুরু হয়েছিলো ঝড়ের

দাপাদাপি। কাজল দেখতে পেয়েছে তাকে, একসময় হঠাৎ চোখ পড়েছে তার উপর।

পাপিয়া ভাবলো, সর্বনাশ, এখন যদি এসে কথা বলে!

কিন্তু সে এলো না একবারও, বিভিন্ন শটের মাঝখানে বিরামের সময়ও নয়, শুটিংএর শেষেও নয়। একটি সীনের কাজ ছিলো সেদিন, তার মধ্যে কয়েকটা শট্ কাজলের। নিজের কাজ শেষ করে সে মেক-আপ তুলতে চলে গেল।

অজিতা বললো, চলো, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, ও যাওয়ার সময় দেখবো।

পাপিয়া কোনো কথা না বলে চুপচাপ তার অনুগমন করলো। স্টুডিওর বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লো পাপিয়া আর অজিতা। অপেক্ষা করতে হোলো কিছুক্ষণ।

কাজল তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে অপেক্ষমানাদের পেরিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো। যাওয়ার সময়ও একবার চোখ পড়লো পাপিয়ার উপর, এবার বেশ কাছের থেকেই। সে একবার তাকালো পাপিয়ার দিকে, যে কোনো লোক আর দশজনের একজনের দিকে যেমনি তাকায়, তেমনি। কোনো কথা বললো না, চিনতে পেরেছে বলেও মনে হোলো না। নিজের মনে চলে গেল, যেমনি করে রাস্তা দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায় অচেনা পথিক।

পাপিয়া এবার বুঝতে পারলো, কাজল যে তাকে চিনতে চায়নি তা নয়, চিনতে সে পারেনি।

হঠাৎ কি রকম একটা আক্রোশে ফুলতে লাগলো পাপিয়া। কাজল যদি তাকে চিনেও চিনতে না চাইতো, সে ক্ষমা করতে পারতো তাকে, সে খুশীই হোতো যে কাজল তাকে চিনতে চায়নি, সে যে মনে মনে তাকে চিনতে পেরেছে, তাকে ভোলেনি, তাইতেই সে পরিতৃপ্ত হোতো। কিন্তু কাজল যে সত্যি সত্যিই তাকে চিনতে পারেনি, এটা পাপিয়ার সহ্য হোলো না। মানুষ এরকম ভুলে যায় কি করে? অতো সহজে ভুলতে পারে মানুষ?

পাপিয়া যতো বেশী ভাবতে লাগলো, ততো ফুলতে লাগলো নিরুপায় রাগে। একবার ভাবলো, সন্ধ্যেবেলা ওর বাড়ি গিয়ে ওকে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবো। কিন্তু জোর করে ঠোট কামড়ে বাড়ি বসে রইলো পাপিয়া।

একবার খুব কান্না পেলো। চুপচাপ বাথরুমে গিয়ে এক পশলা চোখের জল ঝরিয়ে এলো সে। তারপর ভালো করে মুখ ধুয়ে বাইরে এসে মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে ক্যারাম খেলতে বসলো।

খেলার মাঝখানেও দু-বার উঠে বাথরুমে গিয়ে কেঁদে এলো। কিন্তু বাইরে কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। এমনি সে খুব হাসি-খুশি, চঞ্চল, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় তার হাসি, তার চঞ্চলতা, তার দুষ্টুমি যেন অন্যান্য দিনের চাইতেও বেশী।

...আপনি আমায় দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু চিনতে পারেন নি, —পাপিয়া হাসতে হাসতে বললো,—কথা বলবো না আপনার সঙ্গে।

কাজল একটু ভাবলো।

তারপর বললো,—দেখ, স্টুডিওতে যখন থাকি তখন চারদিকে কে আছে না আছে তাকিয়ে দেখবার মতো মনের অবস্থা থাকেনা। তখন থাকি নিজের অভিনয়ের মেজাজে।

সে তো সব সময় থাকেন,—বললে পাপিয়া।

আমি শিল্পী, সেকথা ভুলে যাচ্ছো কেন,—কাজল হাসতে হাসতে বললো।

পাপিয়া বলে গেল,—আজও তো দুবার আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। চিনতেই চাননি। একবার একটু তাকিয়ে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, যেন আমি আপনার অচেনা অনুরাগীদের একজন। তারপর আরেকবার আপনার কাছে গিয়ে অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিলাম। আপনি চোখ না তুলেই নির্বিকার ভাবে সই করে দিলেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন আপনার

আরেকটি সই।—তাই এবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলাম। নিজের লেখা কবিতা দেখে তারপর চিনতে পারলেন।

কাজল হাসতে লাগলো। বললো,—রাজা দুষ্মন্তও অভিজ্ঞান দেখবার আগে শকুন্তলাকে চিনতে পারেনি।

পাপিয়ার মনের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠলো। চোখে প্রকাশ পেলো সেই বেদনা, কিন্তু মুখের উপর নয়। দুষ্টু মেয়ের মতো একগাল হেসে চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে বললো,—ওসব ডায়ালগ সিনেমায় বলবেন। আপনি নিজেকে যা খুশী মনে করতে পারেন, আমি কারো শকুন্তলা নই।

তুমি তাহলে কি ?—কাজল হেসে জিজ্ঞেস করলো।

আমি কারো পাপিয়া,—দু-পাশের দুটো বিনুনি দুলিয়ে পাপিয়া উত্তর দিলো।

—কার ?

পাপিয়া খুব হাসছিলো। বললো,—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার।

—তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে ?

—অনেকদিন।

কাজল কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ বললো,—তোমরা বেশ আছো।

—কেন ?

—তোমাদের জীবনে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ঝামেলা নেই। হৈ-চৈ করে কলেজে পড়লে, তারপর একজনের সঙ্গে ভাব হোলো, ব্যস, তারপর তার সঙ্গে একদিন বিয়ে হয়ে যাবে ধুমধাম করে, শানাই বাজিয়ে। তারপর মনের সুখে ঘর করবে, রান্নাবান্না করবে, স্বামী অফিসে গেলে দুপুরে বসে নভেল পড়বে, রোববার সিনেমা দেখতে যাবে। কোনো ভাবনা নেই জীবনে, সত্যি আমার হিংসে হয়।

সত্যিই তো, বাংলা দেশের গেরস্ত মেয়েকে হিংসে না করবেন তো কাকে করবেন,—আবার বিনুনি দোলালো পাপিয়া।

—আর আমাদের দেখ! জীবনে একটু নিরিবিলি থাকবার

যো নেই। খালি ভিড়, খালি লোকজন চতুর্দিকে, আর পাবলিসিটি আর গ্ল্যামার।

—আহা, বেচারা ফিল্মস্টার! ভিড় যদি এড়াতে চান কে আপনাকে মানা করছে?

—মানা তো ভাই কেউ করছে না। নিরুপায় হয়ে এই অবস্থা মেনে নিতে হচ্ছে। যতই অপছন্দ করি, আমার জন্যে যখন চারদিকে ভিড় জমে যায়, আমায় দেখতে যখন লোকে ছুটে আসে, তখনই বুঝি যে আর্টিস্ট হিসেবে আমি বেঁচে আছি। আমি যে মরে যাইনি সেটা বুঝবার জন্যেই আমায় আকুল হয়ে থাকতে হয় এই ভিড়, এই জনতার জন্যে। ওরা দল বেঁধে আমার কাছে ছুটে আসে বটে, আমিও কিন্তু মনে মনে ওদের কাছে ছুটে যাই।

ওরা যদি জানতো?—চোখ বড়ো বড়ো করে পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

একথার উত্তর কাজল দিলো না। খুব হাল্কা হয়ে বললো,—আমার মাঝে মাঝে ছুটি চাই, কিন্তু ছুটি পাই না।

—কাশ্মীর কি কুলু-ভ্যালি কোথাও চলে গেলেই পারেন।

—সে ছুটির কথা বলছি না পাপিয়া। মনের ছুটির কথা বলছি।

মনের ছুটি?—পাপিয়া হাসলো,—মনকে ফাঁকি দিয়ে কোনোদিন মনের ছুটি পাওয়া যায় না।

মানে?—কাজল মুখ ফিরিয়ে তাকালো পাপিয়ার দিকে।

মানে? কি জানি অনেক কথা আমি না বুঝেই বলি,—পাপিয়া উত্তর দিলো,—তাই সবাই আমায় ছেলেমানুষ বলে।

কাজল হাসলো, তারপর বললো,—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আজ ভালোই হোলো। এবেলা এমন একজনের সঙ্গে আমার খাওয়ার কথা, যাকে দেখলে আমার খাবার হজম হতে চায় না। তাকে বরং খবর দিয়ে দিই যে আজ বিশেষ কাজে আটকে গেলাম, আজ আসবো না। চলো, তুমি আর আমি মিলে আমাদের সেই চেনা দোকানে পরটা কাবাব খেয়ে আসি।

পাপিয়া খুব জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো,—না, না, আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। আমায় হাজরার মোড়ে নামিয়ে দিন।

—সে কি? এদ্দিন পর দেখা হোলো, আমার সঙ্গে তু-মিনিট বসে গল্প করবে না?

—করলাম তো এতক্ষণ। আর নয়, আজ আমার সময় নেই।

—পোনেরো মিনিট?

—এক মিনিটও নয়। বাবা বকবে আমায়।

কি জানি কেন হঠাৎ বাবার কথা মিছিমিছি বলে ফেললো। বাবার কথা মনে পড়তে পাপিয়ার চোখ জলে ভরে এলো। সে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

কাজল লক্ষ্য করলো না। বললো,—আচ্ছা, আজ যদি তোমার সময় নাও বা হয়, কাল কোথায় দেখা হবে বলো।

—কাল নয়, সামনের হপ্তায় কোনো একদিন।

—না, তাহলে দেখাই হবে না।

—কেন?

—আমি পরশু বম্বে ফিরে যাচ্ছি।

—বেশ তো, যান। কাল আমার সময় হবে না।

কেন?—জিজ্ঞেস করলো কাজল।

কাল সে আসছে,—পাপিয়া মিথ্যে লজ্জার ভান করে বললো।

—কে?

কে আবার? ওই যে বললাম, যার সঙ্গে আমার—, যান, বলবো না, আপনি ভারী অসভ্য,—বলে পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে হাসলো।

কাজল হেসে উঠলো। বললো,—ওর গল্প করবে না আমার সঙ্গে?

আরেকদিন,—পাপিয়া উত্তর দিলো।

—আর তো সময় হবে না। আমি যে পরশু চলে যাচ্ছি। কাল সময় করতে পারবে?

—কখন ?

—সকাল বেলা ?

—না, আমার সময় হবে না ?

—কিন্তু এদ্দিন পর দেখা হোলো !

না হলেই বা কী ক্ষতি ছিলো,—পাপিয়া উত্তর দিলো,—এই এক বছর তো আমার কথাও আপনার মনে পড়েনি, আপনার কথাও আমার মনে পড়েনি।

পাপিয়া নেমে গেল হাজরার মোড়ে।

তাহলে আর দেখা হবে না ?—গাড়ির দরজা টেনে বন্ধ করে কাজল জিজ্ঞেস করলো।

—কেন হবে না ? হঠাৎ যদি আবার কোনোদিন এমনি পথে-ঘাটে দেখা হয়ে যায় তো হবে।

কাজলের নেমন্তন্ন ছিলো আলিপুরে এক পরিবেশকের বাড়িতে। সেখানে সবাই লক্ষ্য করলো খেতে খেতে একটু আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জমিয়ে গল্প করছে না। একটু যেন গম্ভীর।

সেখানে অন্যতম অভ্যাগতা ছিলো কোনো এক রুবি রায়চৌধুরী, খাওয়ার সময় বসেছিলো কাজলেরই পাশে। সে কাজলের গাম্ভীর্য দেখে একটা মন্তব্য করতে কাজল হঠাৎ সচকিত হোলো। খেয়াল হোলো এতক্ষণে যে, পাশে যে বসে আছে সে খুব আকর্ষণীয় দেখতে, একেবারে অতিরিক্ত মাত্রায় হালফ্যাশানের, অন্তরঙ্গতা করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

এমনি কাজলের জীবনে তো হয়েই চলেছে একটার পর একটা। কাজল একটু মুচকি হাসলো নিজের মনে। তারপর আনমনা ভাবখানি জোর করে পরিহার করে মুখর হয়ে উঠলো সে। আস্তে আস্তে ভিজতে সুরু করলো রুবি রায়চৌধুরীর মন।

ফেরার সময় রুবি রায়চৌধুরীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন হোলো। কারণ দেখা গেল তার গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না, ব্যাটারি ডাউন হয়ে আছে। রুবি নিজেই তার টু-সীটার ড্রাইভ করে এসেছিলো। গাড়ি স্টার্ট না নেওয়ার পেছনে যে রুবির একটা কারচুপি আছে সেকথা বুঝতে তার দেরি হোলো না। বললো,—গাড়িটা এখানেই আজ রেখে যান। কাল সকালে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। তা নইলে পথের মাঝখানে কোথাও আবার বিগড়ে গেলে মুশকিলে পড়বেন।

—কিন্তু বাড়ি ফিরতে হবে তো।

—চলুন আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

রুবি ন্যাকামো করলো একটুখানি, তারপর রাজী হয়ে গেল মনে মনে খুশি হয়েই। গল্প করতে করতে ইচ্ছে করেই লক্ষ্য করলো না, কাজল রুবির বাড়ির পথ না ধরে অন্যদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কাছাকাছি ময়দানের পাশে একটা সরু আধো-অন্ধকার পথের পাশে গাড়িটা থামতে সে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো,—'এ কি! আমায় কোথায় আনলেন?

এ রাস্তার নাম লাভার্স লেন,—কাজল হেসে বললো।

তাহলে আমরা কেন এখানে এলাম?—তির্যক দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করলো রুবি রায়চৌধুরী।

কে জানে হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে এ পথের নাম সার্থক করবার জন্যে,—বলে কাজল রুবির হাত চেপে ধরলো তার স্বাভাবিক দক্ষতায়।

রুবি রায়চৌধুরী মনে মনে এই চাইছিলো নিশ্চয়ই। অস্ফুট কণ্ঠে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কাজলের মতো অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির সঙ্গে আর কোনোদিন বাক্যালাপ না করবার সংকল্প ঘোষণা করলো, তারপর আস্তে আস্তে তার গায়ে এলিয়ে পড়ে মাথা রাখলো তার কাঁধে। আবেশে তার চোখ দুটো বুঁজে এলো। কী আশ্চর্য মধুর রাত,—সে ভাবলো,—কাজলকুমারের সঙ্গে আমি একা।

কিন্তু কাজল হঠাৎ খুব আনমনা হয়ে গেল। খুব বিষণ্ণ দেখালো তাকে। তার হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল আস্তে আস্তে, সেখান থেকে খসে পড়লো রুবি রায়চৌধুরীর হাত।

রুবি একটু অবাক হয়ে কাজলের দিকে তাকালো।

কাজল কোনো কথা না বলে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিলো। অন্ধকার হয়ে গেল রুবি রায়চৌধুরীর মুখ।

ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে কাজল নিজের বাড়ির পথ ধরলো। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে কি ভেবে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকে তার আরেকজন পরিচিতা। তার বাড়ি এসে উপস্থিত হোলো।

গেটের ভিতর গাড়ি ঢুকিয়ে গাড়ি বারান্দার নিচে এসে হঠাৎ তার মনে হোলো,—না, বাড়ি ফিরে যাই। গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছিলো, কিন্তু তার পরিচিতা তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো।

—একি, তুমি এসে আবার চলে যাচ্ছো কেন?

গাড়ি থেকে নামতে হোলো কাজলকে। বললো,—দুদিনের জন্যে এসেছি, তাই একবার ভাবলাম তোমার খবর নিয়ে যাই। কিন্তু এখন দেখছি, বেশ রাত হয়ে গেছে। তাই ফিরে চলে যাচ্ছিলাম। কাল আসবো।

—না, না, এমন কি আর রাত। এসো, কফি খেয়ে যাও।

কাজল একটু ভাবলো।

বাড়িতে আর কেউ নেই,—একটু হেসে বললো কাজলের পরিচিতা,—ওরা সবাই ডিনারে গেছে মিস্টার মেননের বাড়িতে। আমার একটু মাথা ধরেছিলো বলে আমি আর যাইনি। এসো, ভেতরে এসো।

কাজল গেল না। কি যেন ভাবলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর আরেকদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

বাড়ির পথ ধরে খানিকটা গিয়ে সে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো। গিয়ে উপস্থিত হোলো একটি শৌখীন অভিজাত ক্লাবে।

সেখানে তার চেনা-জানা ছিলো অনেকেই। তাকে উল্লাসের সঙ্গে স্বাগত করলো ওরা। সবার সঙ্গে বসে দুটো কি তিনটে হুইস্কি পান করলো কাজল। বেশ উৎফুল্ল বোধ করলো সে।

ব্যাণ্ডের সঙ্গে সাম্প্রতিকতম মার্কিন নৃত্য চলছিলো আনন্দ-হুল্লোড়ের উন্মাদনায়। পরিচতা এক সিন্ধী মেয়ের সঙ্গে নাচতে গেল কাজল, কিন্তু একটু পরেই তার খুব একঘেয়ে লাগলো। আনমনা হয়ে গেল সে।

তারপর বেরিয়ে চলে গেল পরিচিত পরিচিতাদের অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও।

এবার আর কোথাও গেল না। সোজা বাড়ি চলে এলো।

কলকাতায় তখন বসন্তকাল এসে গেছে। ধোঁয়া যেন একটু কম, উড়িয়ে মুছে নিয়ে গেছে দখিনের হাওয়া। পরিষ্কার আকাশ। চাঁদকে ঘোলাটে মনে হোলো না অন্যান্য দিনের মতো। খাটের পাশে ফুলদানিতে ছিলো রজনীগন্ধা। ঘর ভরে গেছে তারই গন্ধে। কাজল শুয়ে পড়লো চুপচাপ।

মোড়ের পানের দোকানের সামনে রাস্তার উপর বসে সস্তা হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভাঙা গলায় গান গাইছে এক মুসাফির মুসলমান। তার সঙ্গে ঘুঙুর পরে নাচছে একটি বাচ্চা মেয়ে, তার গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে মাঝে মাঝে।

রাত্তিরে এ সময় এ শহরে কোকিলের ডাকও শোনা যায় কখনো কখনো।

কী আশ্চর্য!—কাজল ভাবলো,—আগে তো কোনোদিন জেগে জেগে এত সব শোনবার অবকাশ পাইনি। ক্লাব থেকে ফিরে সোজা গড়িয়ে পড়েছি বিছানায়।

॥ পনেরো ॥

পরদিন সকালবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খুব রোমাণ্টিক মুখের ভাব করে টেলিফোন করছিলো কাকে যেন, হঠাৎ পর্দা ঠেলে পাপিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি টেলিফোন রেখে দিলো।

আমি এলাম,—পাপিয়া চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে বললো।

কেন এলে?—নিস্পৃহ ভাব করে জিজ্ঞেস করলো কাজল,—না এলেই পারতে।

—বেশ, বলুন চলে যাই!

—না, না, না। বোসো। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কি দু-চার মিনিটের জন্যে এসেছো? না বেশীক্ষণের জন্যে এসেছো?

পাপিয়া চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো,—বেশীক্ষণ বসবার সময় কোথায়? এক্ষুণি চলে যাবো। নেহাত আর দেখা হবে না বলেই এলাম।

কাজল হাসলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো,—বেশ, আমার আজকের সমস্ত প্রোগ্রাম আজ বাতিল করলাম তোমার জন্যে।

—শুটিং ছিলো নাকি?

—না, শুটিং ছিলো না ভাগ্যিস। আমাদের সব কিছু বাতিল করা যায়, ওটা বাতিল করা যায় না সহজে। কাল আবার শুটিং আছে। পরশু চলে যাচ্ছি।

পাপিয়া তার বিনুনি দুটো দুলিয়ে বললো,—বেশ, আপনি না হয় বাতিল করলেন আপনার সমস্ত কাজের প্রোগ্রাম, আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাবো।

—যেতে তোমায় দিচ্ছে কে? কেমন যেতে পারো, যাওতো দেখি।

পাপিয়া হেসে ফেললো বাচ্চা মেয়ের মতো।

কাজল বলে উঠলো,—আমি জানতাম, তুমি আজ সারাদিনের জন্যে এসেছো। সত্যি বলিনি ?

কিন্তু সারাদিন করবো কি ?—পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো।

—সে আমি জানি না। প্রোগ্রাম করবে তুমি। আমি শুধু জানি আজকের দিনের জন্যে শুধু তুমি আর আমি। এখন তুমি বলো সারাদিন কি করা যায়।

পাপিয়া একটু ভাবলো। তারপর বলে উঠলো,—খুব হৈ-হৈ করবো সারাদিন, যে রকম কোনোদিন করিনি,—একটু থেমে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো,—যে রকম আর কোনোদিন করবো না।

—কেন ?

—বলিনি, আমার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে ?

—কার সঙ্গে ? সেই জার্মানী ফেরত ইঞ্জিনিয়ার ?

পাপিয়া মুখ টিপে একটু হাসলো,—আপনার মনে আছে দেখছি।

—সেবারও তো বলেছিলে আমায়। এদ্দিন হয়নি কেন ?

নানা গোলমালে দেরি হয়ে গেল,—উত্তর দিলো পাপিয়া,—বাবা বললেন, ভালো করে না দেখে না শুনে কি ঝট করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় নাকি। কিছুদিন বাড়িতে যাওয়া আসা করুক, দেখি ছেলেটা কি রকম…।

ছেলেটাকে তোমার বুঝি খুব পছন্দ ?—কাজল জিজ্ঞেস করলো।

কেন পছন্দ হবে না ?—পাপিয়া উত্তর দিলো তার বিনুনি দুটো দুলিয়ে।

—আজ সারাদিন তুমি যদি বাড়ি না ফেরো, তোমার বাবা তোমায় বকবেন না ?

—বাবাকে বলে এসেছি, আমি যাচ্ছি অমিতাদের বাড়ি।

—অমিতা কে ?

—আমার একজন বন্ধু।

সারাদিন সত্যিই প্রাণ খুলে হৈ-চৈ করে বেড়ালো পাপিয়া আর কাজল।

মার্কেটে, মিউজিয়ামে, চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ালো। নিউ মার্কেটের পেছন দিকে একটি ছোটো রেস্তোরাঁয় পরটা কাবাব খেলো। গঙ্গার ধারে গিয়ে খেলো আলুকাবলি আর ফুচকা। হেস্টিংস্‌এ একটি ক্লাবে গিয়ে কাজল সাঁতার কাটলো। পাপিয়া বসে রইলো একপাশে।

তারপর ওরা চা খেলো, টেনিস খেলা দেখলো।

পাপিয়ার কাছে এই জগতটা একেবারে নতুন। এমনি হয়তো তার আসোয়াস্তি লাগতো, কিন্তু কাজল সঙ্গে ছিলো বলে তার মধ্যে একটুও আড়ষ্টভাব এলো না।

তার খুব ভালো লাগলো।

এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে অনেক গল্প করেছিলো পাপিয়া।

—বাবা আমায় যা ভালোবাসেন, কিছুতেই আমায় কাছ-ছাড়া করতে চান না। অমিয়কে বললেন, তুমি বিয়ের পর আমার এখানে এসে থাকবে। কিন্তু সে কি করে হয়, অমিয়র বাবা শুনবে কেন? তাই ঠিক হয়েছে, একমাস আমরা এ-বাড়িতে থাকবো একমাস ও-বাড়িতে।

—বাবা সেদিন আমায় স্যাকরার দোকানে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি অমিয়ও এসেছে। সে একটি রুবি কিনতে এসেছিলো, আংটি গড়িয়ে লুকিয়ে আমায় পরিয়ে দেবে বলে। সাচ্চা রুবির কী দাম বাবা। কিন্তু যে রুবিটা পছন্দ করেছে, সেটি সত্যি খুব সুন্দর দেখতে।

—অমিয়র বৌদি আমার জন্যে একটি ভারী সুন্দর মুক্তোর সেট্‌ গড়িয়েছেন। নেকলস, বালা, আংটি আর কানের টপ্‌। আমায় নাকি মুক্তো পরলে খুব মানায়। সত্যি?

—বাবা অমিয়কে একটি গাড়ি কিনে দিতে চান। অমিয় একটি টু-সীটার টুরার গাড়ি চাইছে। সে কী বোকা! আমি ওকে বলে দিয়েছি ওসব ছেলেমানুষী গাড়ি আমার চলবে না। আমার ভদ্র গাড়ি চাই।

—বাবার এখন এত কাজের চাপ যে বিয়ের কেনাকাটায় মন দিতে ফুরসত পাচ্ছেন না। বাজার যা কিছু সব মা, আমি আর অমিয় মিলে করছি। বাবা অমিয়কে বলেছেন, তোমাদের জিনিস, তোমরাই দেখে শুনে কিনে নাও।

—বাবা আমায় বড্ডো ভালোবাসেন। সত্যি, আমার বিয়ে হলে উনি কি করে থাকবেন জানিনা। আমি সামনে বসে না থাকলে বাবার খাওয়া হয় না।

অমিয় বুঝি তোমায় ভালোবাসে খুব?—কাজল জিজ্ঞেস করেছিলো।

যাঃ,—পাপিয়া মুখ নিচু করে হাসলো,—আচ্ছা আপনাকে বলছি। কাউকে তো বলিনা; তবে এই একদিন আপনি আমার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু কেমন? '

হ্যাঁ, সত্যি, অমিয় খুব ভালোবাসে আমায়। জার্মানি থেকে যখন প্রথম এসেছিলো, এমন বোকা বোকা ছিলো যে কি বলবো। ওর এখনো গাড়ি নেই। অফিসে যাওয়ার সময় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয়। কী বলবো, মেয়েদের মতো লজ্জা তার, আমাদের বাড়ির কাছে এলে মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে চলে যায়। একদিন টের পেলো যে আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকি তার জন্যে। এখন একবার শুধু ওপরে চোখ তুলে তাকিয়ে যায়।

—এখন লজ্জা ভেঙে গেছে। খুব সহজ হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। বরং মাঝে মাঝে এমন দুষ্টু দুষ্টু কথা বলে না, আমারই লজ্জা করে। ভারী অসভ্য। সব সময় শুধু বিয়ের পর এটা করবো, ওটা করবো, এখানে যাবো, সেখানে যাবো, এমনিতরো সব আজে-

বাজে কথা বলে। সত্যি, আপনারা বড্ডো বাজে কথা বলতে পারেন।

—একদিন জানেন, বাবাকে লুকিয়ে আমি আর অমিয় লেকের পাড়ে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অসভ্য, আমার হাত ধরতে চায়। আমি কষে এক ধমক দিলাম। ধমক খেয়ে এমন মুখ করলে না, আমার খুব কষ্ট হোলো। আচ্ছা বাবা, হাত ধরে যদি সুখ পায়, একটু ধরুক। আমার কি ক্ষতি। ও আমার হাত ধরে বসে আছে এমন সময় দেখি কিনা, কী বলবো আপনাকে, বাবা আর মন্মথবাবু, মানে অমিয়র বাবা, গল্প করতে করতে আসছেন। আমি তো লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই আর কি। অমিয় তো ভয়ে ঘেমেই সারা। কিন্তু বাবা আর অমিয়র বাবা দুজনেই খুব বিচক্ষণ লোক। তাকালেনই না আমাদের দিকে, গল্প করতে করতে চলে গেলেন। দেখতে কি আর পান নি? দেখেছেন ঠিকই, তবে আমরা যাতে লজ্জা না পাই, দেখতে না পাওয়ার ভান করে চলে গেলেন। সত্যি, বাবা এত ভালো!

—জানেন, একদিন অমিয়কে নিয়ে আমি আপনার একটা বই দেখতে গিয়েছিলাম। অমিয় আমার কাছে আপনার অভিনয়ের কী প্রশংসা যে করলে কী বলবো। সত্যি, মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প করা যে কাকে বলে সেদিন বুঝলাম। ওকে আমি বলিনি যে আপনাকে আমি চিনি। আমার বিয়ের সময় তো আপনি কলকাতায় থাকবেন না। শুনুন, পরে যখন আবার কলকাতায় আসবেন, আমার ওখানে, মানে আমার শ্বশুরবাড়িতে চা খেতে আসবেন তো। সত্যি, আসবেন, ভীষণ অবাক করে দেবো অমিয়কে।

—এই শাড়িটা কে দিয়েছে জানেন? অমিয়। সত্যি, বেশ সুন্দর শাড়ি, না?

—হ্যাঁ জানেন, অমিয় ইঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে, বেশ ভালো গান গাইতে পারে। তবে আমার মতো ক্লাসিক্যাল সে গায় না, সে গায় শুধু রবীন্দ্রসংগীত। আজকাল রবীন্দ্রসংগীত যে আমার কী

ভালো লাগে কী বলবো। ভালো আগেও লাগতো, তবে কি জানেন, আজকাল ওই গানগুলোর মধ্যে একটা অন্য রস পাই। যে ভালোবাসে, তার মুখে রবীন্দ্রসংগীত শোনার যে মাধুর্য, আপনি তার কী বুঝবেন ? রেডিওতে কি রেকর্ডে কি গানের আসরে শোনা গানে সে জিনিস পাওয়া যায় না। সেদিন যখন চাঁদ উঠেছিলো, আমরা ছাতে পায়চারি করছিলাম। অমিয় আমায় ওই গানটা শোনাচ্ছিলো, ওই যে, 'কে দিলো চাঁদ তোমায় দোলা'। শুনেছেন নিশ্চয়ই।

—বিয়ের পর আমরা, মানে শুধু আমি আর অমিয়, কিছুদিনের জন্যে শিলং যাবো। শুধু আমায় পড়িয়ে শোনাবার জন্যে সে একটি সঞ্চয়িতা কিনেছে। ও খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে।

—অমিয়র দাঁতগুলো ভারী সুন্দর। হাসলে ওকে খুব সুন্দর দেখায়।

তুমি বুঝি খুব ভালোবাসো অমিয়কে ?—কাজল জিজ্ঞেস করলো।

পাপিয়া মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। মুখে তার সলজ্জ দুষ্টু হাসি। তারপর সহজ ভাবে বললো,—অমিয় এমন ভালো, ওকে সবাই ভালোবাসে। কিরকম লম্বা চওড়া, এক্‌সারসাইজ করা চেহারা। গায়ে খুব জোর, সেদিন আমাদের বাড়িতে একটি ভারী আলমারী সরানো হচ্ছিলো। ঠাকুর আর চাকর মিলে একটা দিক অনেক কষ্টে তুললো। আর অমিয় খুব সহজে একা তুলে ধরলো অন্য দিক।

—সত্যি, ও আমার জন্যে এত ভাবে না, ওকে খুব ভালো লাগে আমার। বিয়ে হবে বলে বাবা আমায় এম-এ পড়তে দেননি, কিন্তু অমিয় বলছে বিয়ের পর আমায় এম-এ পড়তে পাঠাবে। তারপর আমি আর ও একসঙ্গে বিলেত চলে যাবো। আমার ইচ্ছে আছে, ইকনমিক্‌স্‌-এ এম-এ পড়বো, তারপর বিলেতে গিয়ে পি-এইচ্‌-ডি পড়বো লণ্ডন স্কুল অফ্‌ ইকনমিক্‌স্‌-এ।

—জানেন, আমি অমিয়র জন্যে একটা পুল-ওভার বুনে দিয়েছি! আরম্ভ করেছিলাম অনেক আগে, কিন্তু নানা গোলমালে শেষ করতে করতে শীত কাবার হয়ে গেল। কিন্তু অমিয় এমন পাগল, ওকে যেদিন দিলাম সেদিন সে অতো গরমের মধ্যে সেটি গায়ে দিয়ে বসে রইলো। তাকে যে কী বোকা-বোকা দেখাচ্ছিলো কি বলবো।

—আসলে কিন্তু বোকা নয়, ভীষণ চালাক। খুব বুদ্ধিমান, জীবনে কোনো পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়নি। তবে আমার সামনে এলে কি রকম ক্যাবলা বনে যায়। স্বামী হাবা-গাবা হলে খুব সুবিধে কিন্তু। খুব সোয়াস্তিতে সংসার করা যায়। যে মেয়ে বুদ্ধিমান ছেলেকে বিয়ে করে তার মতো বোকা আর নেই।

—অমিয় প্রায়ই বিকেলে চা খেতে আসে আমাদের বাড়ি। বাবা তো থাকেন না, মা-ও ব্যস্ত থাকেন রান্নাঘরের কাজেকর্মে, তাই আমাকেই বসতে হয় ওর কাছে। আমি কিন্তু ওকে চা খেতে দিই না, দুধ দিই এককাপ। এই ক-মাস অফিসে ওর এমন খাটুনি পড়েছে যে কি বলবো। খেটে খেটে কি রকম রোগা হয়ে গেছে। নতুন সংসার করতে যাচ্ছে, এরকম শরীর খারাপ করলে চলবে কেন। তাই আমি ওকে দুধ খেতে বলি খুব। ও আজকাল সকালে একবাটি দুধ খায়, দুপুরে এক গেলাস দুধ খায়, বিকেলে আমার ওখানে খায় এককাপ, আর রাত্তিরে শোয়ার আগে আবার একবাটি।

পাপিয়ার কথা শুনে কাজল হেসে ফেললো।

এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে খানিকটা উত্তেজনাও হয়নি, তা নয়। নিউমার্কেটে দুপুরবেলা বাজার করতে যায় মেয়েরা। কাজলকে দেখে একটা সাড়া পড়ে গেল। দোকানদারেরা বেরিয়ে এলো দোকান ছেড়ে। কাজল পাপিয়াকে নিয়ে এপাশ দিয়ে ঘুরে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে ভিড় এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে

গাড়িতে উঠে পড়েছিলো। পাপিয়া হাসছিলো খুব। এ যেন ছেলেবেলায় টিফিনের সময় স্কুলে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর মতো।

মাঝহপ্তায় চিড়িয়াখানায় লোকের ভিড় কম। কিছুক্ষণ সেখানে বেশ নিরিবিলিই কেটেছিলো। দু-চারজন যারা এসেছিলো, অতো লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখেনি। হঠাৎ একদল স্কুলের ছেলে মেয়ে এলো। তাদের কয়েকজন কাজলকে দেখে ঘিরে ফেললো। তাদের সঙ্গে অটোগ্রাফের খাতা নেই, যে যার খাতা বই পকেটবুক এগিয়ে দিলো। পাপিয়ার খুব ভালো লাগছিলো। কিন্তু কাজল প্রমাদ গুণলো। সে এসেছে নিরিবিলি একটি দুপুর কাটাতে। এসব ঝামেলা সে এড়িয়ে থাকতে চায়। যখন দেখলো অন্যান্য সব ছাত্রছাত্রীরাও ছুটে আসছে খবর পেয়ে, সে পাপিয়ার হাত ধরে এদের ব্যূহ ভেদ করে পালালো। তারপর মিনিট পনেরো কুড়ি স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের প্রায় লুকোচুরি খেলা। সিংহের খাঁচার পেছন দিয়ে, ওরাং-ওটাঙের ডেরার সামনে দিয়ে, শেয়ালের খাঁচার পাশ দিয়ে, সাপের ঘরের ভেতর দিয়ে, এক দলকে এড়িয়ে, আরেকদলকে পেরিয়ে, কাউকে ধোঁকা দিয়ে, কারো সঙ্গে রেস দিয়ে ঝিলের পাড় দিয়ে দৌড় দৌড় দৌড়।

পাপিয়া হেসেই সারা। স্কুল ছাড়বার পর অনেকদিন এত মজা পায়নি সে।

আমার যে কী ভালো লাগছে, কি বলবো,—সে বললো।

তোমার তো ভালো লাগছে, কিন্তু আমার প্রাণান্ত। কোথাও একটু নিরিবিলি বসবার জো নেই,—বলে কপালের ঘাম মুছে কাজল গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

মিউজিয়ামে কেউ বেশি তাকে লক্ষ্য করলো না। পরটা কাবাবের দোকানে সে বাঁধা খদ্দের, সেখানে তাকে কেউ জ্বালাতন করলো না। ক্লাবে সে সবারই চেনা, সবাই শুধু এক একবার ফিরে তাকালো আর বেশী চেনা যারা, চোখে চোখ পড়তে শুধু হাসলো।

সেখানেও ছিলো নিশ্চিন্ত। গঙ্গার পাড় ছিলো নিরিবিলি, সেখানে কারো চোখে পড়লো না ওরা। এক ফুচকাওয়ালাকে ডেকে গাড়ির ভেতরে বসে বসে ফুচকা খেলো।

তখন গোধুলি নেমেছে গঙ্গার ধারে। সোনালী হয়ে আছে পশ্চিমের আকাশ। বড়ো বড়ো জাহাজগুলি নোঙ্গর করে আছে নিশ্চল হয়ে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মোটরলঞ্চের বাঁশি। একটা ছুটো নৌকো ভেসে যাচ্ছে মন্থর গতিতে। জোয়ার আসছে একটু একটু করে।

পাপিয়া!—কাজল হঠাৎ ডাকলো।

—কি?

—তুমি জীবনে কোনোদিন প্রেমে পড়োনি, না?

পাপিয়ার চোখ ছুটি খুব প্রশান্ত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো কাজলের মুখের উপর। এক মুহূর্ত স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য বিরাজ করলো তার মুখে, তার দৃষ্টি ভরে উঠলো স্নেহের ধারায়। খুব আস্তে আস্তে সে মাথা নাড়লো।

তারপর খুব হেসে উঠলো বাচ্চা মেয়ের মতো। গঙ্গার হাওয়ায় তার ছুটো বিনুনির গোড়ায় আঁটা লাল রিবনের বো ছুটো ফুরফুর করছে। হাসতে হাসতে বললো,—সত্যি কথা বলবো? ইচ্ছে যে করতোনা তা নয়, কিন্তু যাদের সঙ্গে ইচ্ছে করতো তারা সবাই দেখি অন্য একজন কারো সঙ্গে প্রেম করছে। সুতরাং কি আর করি, ভালোমানুষ সেজে চুপ করে বসে থাকতে হোলো। আমার মনের খবর তো কেউ জানলো না, তাই সবাই ভাবলো, আহা, পাপিয়া কী ভালো মেয়ে, কোনো ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

কাজল হেসে ফেললো।

সত্যি বলছি,—পাপিয়া বললো,—শখ সব মেয়েরই আছে। শুধু যারা সুযোগ পায়, তাদের হয়, যারা সুযোগ পায় না তাদের হয় না, তাদের সবাই বলে লক্ষ্মী মেয়ে।

—এখন তোমার কারো সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে করে না পাপিয়া ?

পাপিয়া হাসলো—না, এখন আর করে না।

কেন ?

খুব শান্ত গলায় পাপিয়া উত্তর দিলো,—আমি যে এখন একজনকে ভালোবাসি।—তার মুখে হাসি ছিলো না। কিন্তু খুব কোমল তার মুখ, খুব স্নিগ্ধ তার দৃষ্টি।

কাজল হঠাৎ পাপিয়ার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো!

পাপিয়া প্রথমটা বাধা দিলো না। তারপর বললো,—হাতটা ছাড়ুন।

—কেন ?

—না, ছাড়ুন। কেন মিছিমিছি এসব ? আপনি তো আমার বন্ধু। তাই মনে করে তো আমি সঙ্গে এসেছি। অন্য কোনো মন নিয়ে তো আসিনি।

কাজল হাত ছাড়লোও না, কোনো উত্তরও দিলো না। তাকিয়ে রইলো পাপিয়ার দিকে তার ভুবনমোহন রুপালী-পর্দার দৃষ্টি দিয়ে।

পাপিয়া আস্তে আস্তে বললো,—আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাই না। তাতে আপনার অসম্মান হবে। এই একদিনের জন্যে আমি আপনাকে আমার বন্ধু বলে মেনেছি। আমি কি করে আপনার অসম্মান করি ? আপনি নিজেই ছেড়ে দিন।

একটু ধরে রাখলে কি হয়,—কাজল জিজ্ঞেস করলো,—আমার যে ভালো লাগছে।

আমি তো বলেছি, আমি একজনকে খুব ভালোবাসি,—বলতে বলতে পাপিয়ার গলা ধরে গেল, জলে টলটল করে উঠলো ওর ডাগর ডাগর চোখ দুটো,—এসব ছেলেমানুষী করা আমার পক্ষে ঠিক নয়।

পাপিয়ার চোখে জল দেখে হঠাৎ কাজলের বুকের মধ্যে একটা কি রকম যেন দুর্বোধ্য অনুভূতির সঞ্চার হোলো। সে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলো পাপিয়ার হাত।

তারপর বললো,—চলো, এবার বাড়ি যাই।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পাপিয়া কাজলের সঙ্গে তার বাড়িতেই এলো। নিজের পুরোনো পাড়া। চারদিক তাকিয়ে দেখলো। নিজেদের পুরোনো বাড়িটার উপর চোখ পড়তে পুরানো দিনগুলো মনে এসে টনটন করতে লাগলো বুকের ভেতরটা।

বারান্দায় কেউ ছিলো না, কাজল একবার তাকিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলো,—যদি তোমার বাবা কি মা তোমায় দেখে ফেলতেন ?

পাপিয়া মুখে কোনো উত্তর দিলো না। শুধু ঘাড় নাড়লো আস্তে আস্তে।

বাড়িতে ঢুকে দুজনে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলো। কাজল জিজ্ঞেস করলো,—এখানেই ফিরলে কেন ? তুমি তো প্রত্যেকবার বাড়ি থেকে অনেক দূরে পথের মধ্যে নেমে পড়তে।

—আপনার বাক্স গুছিয়ে দেবো বলে এলাম। পরশু তো আপনি বম্বে চলে যাচ্ছেন।

—আজ নয়। কাল সন্ধ্যেবেলা এসো, একটু বেড়াতে যাওয়া যাবে।

পাপিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো,—না, সে আর হয় না। কাল আমার আশীর্বাদ। এর পর কিছুদিন আর বাড়ি থেকে একলা বেরোতে পারবো না।

আশীর্বাদ !—কাজলের মুখ একটু ম্লান হোলো। কি যেন একটা ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার সহজ হয়ে বললো,—এসো, আমার কাছে এসে বোসো।

কাছে এসে বসতে যাবো কেন ?—বললো পাপিয়া, কিন্তু এলো। এসে সোফার উপর কাজলের ঠিক পাশে এসে বসে পড়লো।

পাপিয়া,—কাজল বললো—তোমার হাতটা ধরতে ইচ্ছে করছে।

পাপিয়া গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলো, তারপর বললো,—অতো যখন ইচ্ছে করছে, ধরুন। আমার হাত ধরে আপনি যদি একটু আনন্দ পান, আমার কি ক্ষতি ?

কাজল ধরলো পাপিয়ার হাত। তারপর বললো,—দেখ পাপিয়া, তুমি বড্ডো ভুল করেছো আমার সঙ্গে এসে।

—কেন?

—তুমি জানো না, আমি লোকটা ভালো নয়?

—শুনেছি।

—তাহলে?

—আমি আপনাকে ভয় পাই না।

—কেন?

—আপনি আমাকে বন্ধু বলে মেনেছেন, আর কোনো মেয়েকে তো বন্ধু বলেন নি কোনোদিন।

—মনে করো ওটা আমার ছলনা।

—কিন্তু আমি তো আপনার সঙ্গে ছলনা করিনি। আমি আপনাকে বন্ধু বলে মেনেছি। আপনি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা তো রাখবেন।

কাজল হাসলো। বললো,—দেখ পাপিয়া, আমার সঙ্গে যখন যে মেয়ের আলাপ হয়েছে, তারই সঙ্গে আমি ভালোবাসার খেলা খেলেছি কিছুদিন। একমাত্র তোমার কাছে যদি আমি হার মেনে যাই, তাহলে এই গ্লানির বোঝা নিয়ে আমার জীবন কাটবে কি করে? আমায় তোমার একদিনের জন্যেও পেতে ইচ্ছে করে না? আমি তোমায় একদিনের জন্যে একান্ত আমার করে নিতে চাইছি, এর চাইতে বড়ো সম্মান আমি তোমায় কি দেবো বলো?

পাপিয়া মনে খুব ব্যথা পেলো। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, —ভালোবাসা বুঝি আপনার কাছে এক প্রহরের খেলা?

—তা ছাড়া আবার কি? সিনেমায় যা দেখা যায়, জীবনে সে-সব সত্যি সত্যি হয় নাকি।

ভালোবাসা আমার কাছে খেলা নয়,—দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পাপিয়া উত্তর দিলো—ভালোবাসা আমার কাছে সারা জীবনের সাধনা।

পাপিয়ার কথাগুলো নির্জন ঘরে মন্দিরের আরতির মতো বেজে

উঠলো। কাজল অবাক হয়ে তাকালো পাপিয়ার দিকে। সেই মুহূর্তে মনে হোলো, পাপিয়াকে যে অতো সহজ ছেলেমানুষ মনে হোতো, তা সে নয় কিন্তু। সৃষ্টির চিরন্তন নারীর এক মহিমান্বিতা মধুময়ী প্রতিরূপ দেবীপ্রতিমার মতো তার ঘর আলো করে বসে রয়েছে।

কাজল অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর একটু হেসে বললো,—পাপিয়া, তোমার কাছে আমি হার মানলাম। জানিনা কেন, হার মেনে ভালো লাগলো। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

—বলুন।

—তোমার বিয়ের সময় আমি তো এখানে থাকবো না। তোমায় একটা উপহার দিতে চাই। নেবে?

পাপিয়া ম্লান হাসি হাসলো।

কাজল নিজের আঙুল থেকে একটি পান্নার আংটি খুলে পাপিয়ার আঙুলে পরিয়ে দিলো।

বাঃ, বেশ সুন্দর আংটি,—হাসতে হাসতে অবলোকন করলো পাপিয়া। তারপর বললো,—আচ্ছা, আপনার বিয়ের সময় তো আমিও থাকবো না। আপনার জন্যে উপহারটি এখনই দিয়ে রাখি।

পাপিয়ার হাতে মিনে করা একটি সোনার আংটি ছিলো। সেটি খুলে নিয়ে কাজলের হাতে পরিয়ে দিলো।

কাজল পাপিয়ার হাত ধরে বললো,—আমার খুব ভালো লাগছে পাপিয়া। আমার বৌকে এই আংটি দেখিয়ে বলবো, এই দেখ, এই আংটি আমায় এমন একজন দিয়েছে যে আমায় খুব আপন বন্ধুর মতো স্নেহ করতো।

সারাদিন কী গরম ছিলো বাবা, মুখটা ঘামে চটচট করছে, বললো পাপিয়া,—মুখটা একটু ধুয়ে আসি, কেমন?

বাথরুমে পাপিয়া গিয়েছিলো কাঁদবার জন্যে। তার বুক ফেটে কান্না আসছিলো অনেকক্ষণ থেকে। এতক্ষণ মুখে হাসি ভরে সামলে রেখেছিলো, এবার আর পারলো না।

কাজল কিছু টের পেলো না। ও যখন বাথরুম থেকে ফিরে এলো, তখন ওর মুখটা বেশ টাটকা, সতেজ, স্নিগ্ধ। সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে পাউডার মেখে নিয়েছে সে।

রাত হয়ে আসছে, আমি এবার যাই,—পাপিয়া বললো।

পাপিয়ার কথাগুলো মনে পড়তে কাজলের হাসি পাচ্ছিলো। ভালোবাসা! সে ভালোবাসে একজনকে! তার ভালোবাসা সারা-জীবনের সাধনা! —নিজের মনে কাজল হেসে উঠলো একবার।

তারপর এক সময় দেখে হাসি আর পাচ্ছেনা।

একবার ভাবলো মঞ্জরী মিত্তিরকে ফোন করি, ওকে নিয়ে ক্লাবে যাওয়া যাক; কিন্তু ফোন তুলতে গিয়ে রেখে দিলো।

তারপর একবার মনে হোলো, মিসেস রায়চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে কফি খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া যাক। তার কাছে ফোন করতে গিয়ে করতে পারলো না। নিজের জায়গায় ফিরে চুপ করে বসে রইলো।

পাপিয়ার কথা মনে পড়লো। ভালোবাসা আমার সারাজীবনের সাধনা! কী পাগল এই বাচ্চা মেয়েরা।

ছাইদানে সিগারেটের টুকরোর পাহাড় গড়ে উঠলো।

বাড়ি ফিরে পাপিয়া চুপচাপ বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে বসে রইলো কিছুক্ষণ। বার বার হাতের আংটিটা অনুভব করলো। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ে পড়লো তাড়াতাড়ি।

জানলা দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যাচ্ছিলো। চাঁদ দেখে পাপিয়া নিজের মনে খুব হাসলো। ভাবলো,—আয় ভাই চাঁদ, সেই ছেলেবেলার মতো টী দিয়ে যা। তোর পাপিয়া যে জীবনে কতো-খানি ব্যথা পেলো, তবু তার অনেক বেশী পেলো সুখ, একথা তুই ছাড়া আর কেউ জানবে না। কবিরা তোকে নিয়ে কবিতা লেখে। আমি তোকে আমার একটুখানি হাসি দিলাম। যে কোনো কবিতার চাইতে আমার এ হাসির দাম অনেক বেশী।

॥ ষোলো ॥

সকালবেলা কাজল জানলায় এসে দাঁড়ালো। তাকালো পাপিয়াদের বাড়ির জানলার দিকে। একটি মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

কাজল হাত নাড়লো।

সেও হাত নাড়লো।

আরো দু-তিনটি ছেলে ও মেয়ের মুখ সেখানে উঁকি মারলো। ওরাও হাত নাড়তে লাগলো!

কাজলের কানে ভেসে এলো ওরা সমস্বরে চ্যাচাচ্ছে,—কাজলকুমার! কাজলকুমার! কাজলকুমার!...

এতক্ষণে কাজলের খেয়াল হোলো। ওদের একজনও পাপিয়া নয়। সে জানলা বন্ধ করে সরে এলো। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো কিছুক্ষণ। তারপর বাইরে এসে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, গিয়ে উপস্থিত হোলো পাশের বাড়ি। দরজার বেল টিপতে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর কাছে জানতে পারলো যে ওটা নীহার চাটুজ্যের বাড়ি নয়। নীহার চাটুজ্যে কে এবং কোথায় থাকে তিনি বলতে পারেন না। তিনি বাড়ির ভাড়াটে এবং বাড়ির মালিকের নাম নীহার চাটুজ্যে নয়।

কাজল অবাক হয়ে নেমে এলো।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হোলো যেন উনি এপাড়ার পুরাতন বাসিন্দা। তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো কাজল। তাঁর মুখে শুনলো যে, বছরখানেক হোলো নীহারবাবু মারা গেছেন। টাকা-কড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তাই বাড়িটা বেচে দিয়ে পাপিয়ারা চলে গেছে। এখন মামার বাড়ি থাকে, ঠিকানা তিনি জানেন না।

কাজল একটু ভাবলো। মনে পড়লো এ পাড়ার কোনো এক

মন্মথবাবুর জার্মান ফেরত ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে পাপিয়ার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। তিনি নিশ্চয় জানেন পাপিয়ার ঠিকানা।

—আচ্ছা, মন্মথ বাঁড়ুজ্যে নামে এক ভদ্রলোক এপাড়ায় থাকেন। তাঁর বাড়ি কোনটা বলতে পারেন?

—আমিই মন্মথ বাঁড়ুজ্যে।

আপনি? —খুশী হোলো কাজল,—আচ্ছা, আপনার একটি ছেলে আছে না? জার্মানি ফেরত? ইঞ্জিনিয়ার?

—হ্যাঁ।

—তার সঙ্গে কি নীহারবাবুর মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে আছে?

মন্মথবাবু এবার অবাক হয়ে কাজলের দিকে তাকালেন। —হ্যাঁ, এক সময় কথাবার্তা খানিকটা এগিয়েছিলো বটে, কিন্তু ঠিক কিছু হয়নি। তার এখন অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে কাজল স্তম্ভিত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে গড়িয়ে পড়লো সোফার উপর।

শুটিং ছিলো সেদিন। একটু পরে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

সেদিন বাড়ির সবাই দেখলো পাপিয়ার চোখে মুখে একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তি। খুব শান্ত সে,—এত শান্ত কোনোদিন দেখা যায়নি তাকে। চুপচাপ নিজের মনে সে বাড়ির কাজকর্ম সব করলো, রান্না-বান্না করে, সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে নিজের চান খাওয়া সেরে, দুপুর বেলা তানপুরো নিয়ে বসলো।

মনোরমার মনে নানা প্রশ্ন জাগলো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলো না।

বাড়ির সবাই লক্ষ্য করেছিলো এই পরিবর্তন। তার সেই ছেলেমানুষী চঞ্চলতা একটুও নেই, মুখে বেশী কথা নেই, শুধু একটা স্নিগ্ধ তৃপ্তির হাসি।

কাজলের মাসতুতো ভাই সুবিমল দীপ্তিকে বিয়ে করবার পর পার্ক সার্কাসে একটি ফ্ল্যাট নিয়েছিলো। কাজল কলকাতায় এলেই একবার দীপ্তির কাছে যেতো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সে এসে হাজির হোলো। এসে বললো—তোমার বন্ধু পাপিয়া আচ্ছা মেয়েতো!

কেন? -- দীপ্তি চোখ তুলে তাকালো।

—ওর বাবা যে মারা গেছেন, আমায় সে খবর জানায়নি, ওরা যে ওই বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে, সে কথাও আমায় বলেনি, বরং কোন একজন ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে যে তার শিগগিরই বিয়ে হবে এরকম অনেক কথা আমায় বানিয়ে বানিয়ে বললো। আমি ভাবলাম, তাই হবে হয় তো। কিন্তু আজ সকালে সেই ছেলেটির বাবার সঙ্গে দেখা হতে সব জানলাম।

দীপ্তি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো,—আপনি কবে তার খবর নিয়েছেন কাজলদা?

কাজল হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেলো না।

দীপ্তি জিজ্ঞেস করলো,—ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে বুঝি?

—কাল সারাদিন ছিলাম একসঙ্গে।

সারাদিন!—দীপ্তি স্তম্ভিত হোলো,—ওকে নিয়ে কেন আপনি খেলা করছেন কাজলদা? আর যার সঙ্গে যাই করুন, ওর সঙ্গে এরকম করবেন না। ও বড্ড সরল, বড্ড ভালো। কী সুখে ছিলো সে, তার বাবা মারা যাওয়ার পর এখন যে কী কষ্টে আছে বলার নয়। ওকে নিয়ে খেলা করবেন না।

খেলা!—কাজলের চোখ কপালে উঠলো,—আমি করছি পাপিয়ার সঙ্গে খেলা?—বিশ্বাস করো দীপ্তি, পাপিয়া হচ্ছে একমাত্র মেয়ে যার সঙ্গে আমি কোনো অশোভন ব্যবহার করিনি। ও যে মুহূর্তে বলেছে ও একজনকে খুব ভালোবাসে, সেই মুহূর্তে আমি ওর ভালোবাসাকে সম্মান করেছি। কিন্তু আমি কি বোকা! ওর ওই মিছে কথাটা

আমি বিশ্বাস করেছি। আমি কি জানতাম যে ওই ইঞ্জিনিয়ার ছেলে অমিয়র কথা সব বানানো ?

দীপ্তি হেসে ফেললো।

—হাসছো কেন ?

—আচ্ছা, কাজলদা, আপনি কি কিছু বোঝেন না ?

কি বুঝি না ?—কাজল দীপ্তির দিকে অবাক হয়ে তাকালো।

—ওর সঙ্গে ওরকম মাখামাখি করা আপনার উচিত হয়নি। আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম ওকে মানা করে দিতাম।

কেন ?—কাজল কিছুই বুঝতে পারলো না।

দীপ্তি ভেবেছিলো কাজলকে কোনোদিন বলবে না, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আর দশজন মেয়ের মতো সে কিছুতেই পেটে কথা রাখতে পারলো না। বলে ফেললো কাজলকে, তারপর ঝালঝাল দুটো কথা শুনিয়ে দিলো।

পুরুষ জাতটাই এরকম,—বলে গেল দীপ্তি,—আপনি এরকম একজন ধনী ফিল্মস্টার, আর ও একটি সামান্য গরীব মেয়ে, আপনি ওকে কোনোদিন বিয়ে করতে যাবেন না, অথচ সেও সোসাইটি গার্ল নয় যে আপনার আর দশজন বান্ধবীর মতো আপনার সঙ্গে একটু ফ্লার্ট করে নেবে, এসব বুঝবার বুদ্ধি আপনার ছিলো না ? কেন সব জেনে শুনে ওকে নিয়ে অতো ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন ?

কাজলও একটু রেগে গেল। বললো,—আমি ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি বলে কি তাকে দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি ?

দীপ্তিও রাগলো,—ও তো আপনার কাছে কিছু চায় নি। ও আপনাকে কিছু বলতেও যায়নি। কিন্তু আমি চুপ করে থাকবো কেন ? ও আমার বন্ধু। আপনি যতো মস্তো লোকই হন্, আপনি আমার দাদা। তাই আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার আমার আছে।

মেয়েমানুষের কথার ঝড়ের সামনে পড়ে আর দশজন পুরুষের মতো কাজল বোকা বনে গেল। বললো,—আমার কি দোষ ?

—কেন আপনি ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে গিয়েছিলেন ? আবার তাকে নিয়ে কাল সারাদিন কাটানোর কি দরকার ছিলো ?

—আমি এখন কি করতে পারি বলো।

দীপ্তি গম্ভীর ভাবে বললো,—সে আমি জানি না, আপনার মনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তবে একথা জেনে রাখবেন, আপনার ছেলেমানুষির জন্যে ও যদি জীবনে কোনো কষ্ট পায়, আমি আপনাকে কোনোদিন ক্ষমা করবো না। আপনি মস্তো লোক হতে পারেন, কিন্তু আমার কি ? আপনার মতো লোকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলে আমার কিছু আসে যায় না।

কাজল চুপচাপ উঠে চলে গেল।

সুবিমল ফিরলো একটু রাত করে।

দীপ্তি বললো,—আজ কাজলদা এসেছিলো।

—জানি। আমি কাজলদার ওখানেই ছিলাম এতক্ষণ।

উনি কি কাল চলে যাচ্ছেন ?—দীপ্তি জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ, প্যাসেজ তো বুক করা হয়েছে—সুবিমল উত্তর দিলো—কাজলদার খুব মাথা ধরেছে। চুপচাপ পায়চারি করছে ঘরের ভিতর। কারো সঙ্গে দেখা করছে না।

ওসব যতো ফিল্মস্টারের ঢং—ঠোঁট উল্টে বললো দীপ্তি।

॥ সতেরো ॥

সুবিমল বাড়ি ছিলো না। সেদিন সকালের প্লেনে কাজলের বম্বে চলে যাওয়ার কথা। সে গিয়েছিলো এয়ার পোর্টে।

দীপ্তি ব্যস্ত ছিলো রান্নাঘরের কাজকর্ম নিয়ে। চাকরটা সবে বাজার করে ফিরেছে। তার কাছ থেকে হিসেব বুঝে নিচ্ছিলো। সুবিমল বাড়ি ফিরে চান করে খেয়ে কাজে বেরোবে। তাই তাড়াতাড়ি রান্না চাপাতে হবে তার জন্যে।

দীপ্তি একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর শুনতে পেলো রাস্তায় বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে থেমেছে। দুপদাপ করে কারা যেন উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোলো। চাকর গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দীপ্তি বেরিয়ে এলো সুবিমলের সাড়া পেয়ে।

সুবিমলের পেছন পেছন, কাজল ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে একটু অবাক হোলো দীপ্তি। জিজ্ঞেস করলো একটু ব্যস্ত হয়ে,—কি হোলো? প্লেন ধরতে পারেন নি বুঝি?

সেকথার উত্তর কাজল দিলো না। বললো,—দীপ্তি, এক্ষুনি তৈরী হয়ে নাও।

—কেন?

—বেরোতে হবে আমার সঙ্গে।

কোথায়?—অবাক হোলো দীপ্তি।

—পাপিয়ার ওখানে।

পাপিয়ার ওখানে! খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে দীপ্তি তাকালো কাজলের দিকে। আস্তে আস্তে তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। বুঝতে দেরী হোলো না একটুও।

—আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি এক্ষুনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। একটু চা খেয়ে নিন ততক্ষণে।

কাজল অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর দিলো,—ওসব এখন থাক। আমার বড্ড তাড়া। আমি এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবো না।

দীপ্তি কিন্তু তাড়া করলো না। একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কাজলদা, আমি পাপিয়ার বন্ধু। আমায় বলতে হবে, পাপিয়ার কাছে আবার কেন। আপনার খেলা কি এখনো ফুরোয় নি।

খেলা!—কাজল ম্লান হাসি হাসলো। আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর বললো,—কালকের রাত আমার কি ভাবে কেটেছে তুমি জানো না দীপ্তি। তবু মন স্থির করতে পারছিলাম না। দমদম যাওয়ার সময় সারাটা পথ ভেবেছি। তখনো ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। প্লেনে উঠতে যাবো, এমন সময় মনে হোলো,—না তো, আমার পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব নয় পাপিয়াকে এখানে একলা রেখে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে কিছুতেই পা সরলো না। আস্তে আস্তে ফিরে এলাম।

পাপিয়াকে গিয়ে কি বলবেন?—দীপ্তি স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কাজল একটু ভাবলো। তারপর বললো,—বেশী কিছু বলবো না। শুধু বলবো, আমি ফিরে এলাম পাপিয়া, এখন তুমিই জানো, আমি আর কিছু জানি না।

ওসব সিনেমার ডায়ালগ ছাড়ুন,—দীপ্তি বললো,—কথা যা বলবেন ওর মায়ের সঙ্গে বলতে হবে। পারবেন তো?

কাজল আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো,—হ্যাঁ, পারবো। নিশ্চয়ই পারবো। সে জন্যেই তো ফিরে এলাম।

দীপ্তি খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো কাজলের দিকে। তারপর হাসিমুখে বললো,—আচ্ছা আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণে আপনিও তৈরী হয়ে নিন।

আমি? আমি আবার কি তৈরী হয়ে নেবো?—কাজল বিস্মিত হোলো।

—ওই পোশাক পরে আপনার ওই মস্তো বড়ো গাড়ি চড়ে যাবেন নাকি? সে চলবে না। লোকে আপনাকে দেখে ভিড় করবে, একটা হৈ-চৈ বেধে যাবে ওই পাড়ার ভিতর। ওরা সাধারণ গেরস্ত লোক, সাধারণ গেরস্ত-পাড়ায় থাকে, কেন ওদের এই দুর্ভোগ ভোগানো। আমি ধুতি শার্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার জন্যে, আপনি চুপচাপ সাধারণ গেরস্ত ঘরের ছেলে সাজুন দেখি। ইতিমধ্যে আমি একটি ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনছি।

পাপিয়ার মামার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামলো। দীপ্তির পেছন পেছন নেমে এলো কাজল আর স্নুবিমল।

দীপ্তি কড়া নাড়তে পাপিয়ার মামা নিজেই বেরিয়ে এলেন।

এই যে দীপ্তি, এসো, এসো, অনেকদিন আসোনি তুমি,—বললে দীপ্তির মামা। একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো তাঁকে,—কিন্তু পাপিয়া তো নেই। তুমি খবর পাও নি? কাল যদি আসতে ওর সঙ্গে দেখা হোতো।

আকাশ থেকে পড়লো দীপ্তি।

—পাপিয়া নেই? কোথায় গেছে।

—ও ওর মাকে নিয়ে চলে গেছে। আজ সকালেই গেছে।

—কোথায়?

—চুঁচড়োয়। ওখানে একটি স্কুলে চাকরি নিয়েছে সে। ও আর ওর মা ওখানেই থাকবে। এখানে আর আসবে না।

কোন স্কুল? ওর ঠিকানা কি?—কাজল জিজ্ঞেস করলো ব্যস্ত হয়ে।

পাপিয়ার মামা কাজলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বোধ হয় মনে হোলো ও মুখ খুব চেনা, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলেন না কোথায় দেখেছেন।

ওর ঠিকানাটা দিন না,—দীপ্তিও বললো খুব ব্যগ্র কণ্ঠে।

ঠিকানা!—ম্লান হাসি হাসলো পাপিয়ার মামা—ওর ঠিকানা

আমি জানি না। আমায় বলেনি। শুধু বলেছে, পরে চিঠি লিখে জানাবে। জানাবে কবে কে জানে, হয়তো চিঠি লিখবে কালেভদ্রে। কিন্তু কোনোদিন সে আর এখানে ফিরবে না। ওকে আমি এবাড়ি এনে সুখে রাখতে পারলাম না। ওর মামীমা সামান্য সামান্য ব্যাপারে এমন সব অশান্তির সৃষ্টি করতো যে, কি আর বলবো। পাপিয়া আমার অভিমানী মেয়ে। কাউকে কিছু বললো না। চুপচাপ চলে গেল।

বলতে বলতে বুড়ো মানুষের চোখে জল এলো। উনি কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন।

তখন কলকাতায় পরিপূর্ণ বসন্তের স্নিগ্ধতা। আকাশ ধোঁয়াটে-নীল। দমকা হাওয়ায় অশান্ত সব জানলার পর্দাগুলো। ওধারে বড়ো রাস্তার দুপাশের গাছে গাছে স্তবকে স্তবকে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া বুগেনভিলিয়ার সম্ভার।

এদিকে সরু গলির ভেতর দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে চলে গেল এক ভালুকওয়ালা, তার পেছন পেছন ছেলের পাল। অফিসের জন্যে তৈরী হচ্ছে এ-বাড়ি ও-বাড়ির বাবুরা। দখিন হাওয়ায় ভেসে আসছে রান্নাঘরের মাছ ভাজার গন্ধ। সামনের তেতলা বাড়ির ওধার থেকে সূর্য চড়ে এলো আকাশে। এক ঝলক হলুদ রোদ্দুর পথের উপর ছড়িয়ে পড়লো। বিক্রিওয়ালা তার পুরোনো শিশি-বোতল-কাগজের চটের থলিটা পিঠের উপর ফেলে একটু দাঁড়িয়ে দেখলো। দুটো হাসিখুশি বাচ্চা মেয়ে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে এক্কা-দোক্কা খেলছে রাস্তার একপাশে। হয়তো তার মনে পড়লো দেহাতে নিজের মেয়ের কথা। ঝলমলো মুখে একটি বিড়ি ধরিয়ে সে একটা দেহাতী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল।